একটি জলের রেখ

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

চিরন্তনী প্রকাশ ভবন

৪এ, হেমচন্দ্র নস্কর রোড,
কলিকাতা-৭০০০১০

প্রকাশক :
মাধুরী দত্ত
৪এ, হেমচন্দ্র নস্কর রোড,
কলিকাতা—৭০০০১০

প্রথম সংস্করণ : ১লা বৈশাখ ১৩৬২

দ্বিতীয় সংস্করণ : ১লা আশ্বিন, ১৩৬৩

প্রচ্ছদ শিল্পী :
গৌতম রায়

দাম—দশ টাকা

মুদ্রক :
শ্রীগৌরীশংকর রায়চৌধুরী
জয়ন্তী প্রিন্টিং প্রেস
৮/এ, দীনবন্ধু লেন
কলিকাতা—৭০০০০৬

পরিবেশক
স্যাঙ্গুইন পাবলিশার্স কনসার্ন
৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০০৯

উৎসর্গ

শ্রীমান শমিত, শুভাশিষ

এবং শান্তির জন্য

ভালোবাসার পাখীকে

॥ এক ॥

শালিখের গায়ের রঙ দেখে ওরা বুঝতে পারল ধানক্ষেতের আলে ধানগাছের ছায়া এবার হেলে পড়বে। সুতরাং রওনা হতে হয়। চুপি চুপি ওরা তিনজনই ঘাটের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। কোষা-নৌকাটা গাবগাছের গুঁড়িতে বাঁধা। লম্বা দড়ি দিয়ে ভুলুই ভোরে বেঁধে রেখেছিল নৌকাটা। গাবগাছের অন্য ডালটায় দু-তিনটে বেতের আঁকশি। ওরা সন্তর্পণে মাথা নীচু করে আঁকশিগুলো অতিক্রম করল। তখন গাঁয়ের পালক-ওঠা কাকটা গাবগাছ থেকে উড়ে দক্ষিণের বাড়ির ডালিমগাছটায় গিয়ে বসল। তিনজনের একজন ভাবল দক্ষিণের বাড়ির ডালিমগাছটায় নিশ্চয়ই একটা ডালিম পেকেছে।

এখন বর্ষাকাল। বাড়ির ঘাটে জল, উঠোনে জল। সামনে পিছনে যেদিকে চাওয়া যায় সেদিকে জল। ঘাটের দুপাশে দুটো বেতের ঝোপ। ঘাট পার হলে খাল। খালটা দক্ষিণের বাড়ির ঘাট ছুঁয়ে সেনেদের বাড়ি বাঁয়ে রেখে মাঠে গিয়ে মিশেছে। আমগাছ, গাবগাছ, সজনেগাছের ছায়ায় ছায়ায় খাল। খালের জল কালো। জামফলের মতো জলের রঙ। ঘাটের জল কিন্তু টলটলে পরিষ্কার। জল এখানে অগভীর। সেজন্যই ওরা তিনজন জলের নীচের মাটি দেখতে পাচ্ছে। ট্যাংরা মাছ, পুঁটি মাছ দেখতে ঘোলা জলে। ওদের পায়ের শব্দে মাছগুলো শ্যাওলার নীচে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কোষা-নৌকার গলুই, পিছু কিছু নেই। কিন্তু ওদেরই তিনজনের কাছে নৌকাটা খুবই আদরের, সোহাগের। গলুই, পিছু ওরা নিজেরাই ঠিক করে নিয়েছে। ভুলু গলুইয়ের ওপর জল ঢেলে বলল, বিশকরম। তিনবার গলুইতে হাত ঠেকিয়ে কপালে হাত ঠেকাল ভুলু। হারাণের কাছ থেকে এক এক করে তিনটে বৈঠা নিয়ে কোষার পাটাতনে রাখল। বলল, বালিশ এনেছিস হারাণ? দুটো বালিশ হলে ভালো হত রে। কোনরকমে তিনজনে শোওয়া যেত।

—বালিশ! হারাণ নাক কুঁচকাল। চোখ উল্টাল।—বল না তোষক, জাজীম, বদরীছঁকো। পিছনের দিকে ঘাড় ফেরাল হারাণ। নারাণকে অন্যমনস্ক হতে দেখে সে হাসল। ভুলুর খুড়তুতো বোন জানালায় বসে ওদের চুপি চুপি নৌকা নিয়ে চলে যাওয়াটা দেখছে।

হেনা খুব রোগা আর পাণ্ডুর। চোখ দুটো মাকড়সার জালের মতো ঘোলা। অনেকদিন ধরে অসুখে ভুগছে। শরীর ভালো থাকলে হেনা এই ঘাটে এসে দাঁড়াত। ফ্রকের নীচ থেকে দুটো লটকনের থোকা চুপি চুপি ভুলুর হাতে তুলে দিত আর বলত অনেক কথা। মা, মাসীর মতো সাবধান করে দিত তাদের।

ভুলু নৌকায় উঠতেই জল নড়ে উঠল। ঢেউগুলো দক্ষিণের বাড়ির ঘাটে গিয়ে একটার পর একটা থামছে। গলুই থেকে হাত বাড়িয়ে নারাণের কাছ থেকে দুটো বড় কৌটা নিল। দুটো থালা নিল। আরশোলার কৌটাটা কানের কাছে ঝাঁকিয়ে বলল, তিনদিন চলবে তো?

—চলবে না! ওর বাবা চলবে।

—গতবার যাব বলে দু-কৌটা আরশোলা ধরেছিলাম। কিন্তু শেষে আর যাওয়া হল না। ধরা পড়ে গেলাম। হেনা গতবার সারাদিন ধরে তক্তপোষের নীচে বসেছিল আরশোলা ধরবার জন্য। এবার ত ওর অসুখ, কিছুই করতে পারল না। ভুলু নারাণের হাত থেকে দা নেবার সময় কথাগুলো বলে আফসোস করছিল।

নারাণ নৌকায় ওঠার সময় বলল, তোর ঠাকুমা, কাকীমা কেউ ভাল নয়। গতবার তোর ঠাকুমা, কাকীমাই তো আমাদের যেতে দিলে না।

ভুলু চুপ করে থাকল। গাবগাছের গুঁড়ি থেকে সে এখন দড়ির গিঁঠ খুলছে। সে যেন কিছু ভাবছে। নারাণ ওর মনে দুঃখ দিল— ঠাকুমা ভাল নয় একথা বলে। কিন্তু কাকীমা সম্বন্ধে সে কিছু ভাবতে পারল না।

সকলের শেষে উঠল হারাণ। খুব জোরে সে নৌকাটা ঘাট থেকে ঠেলে দিয়েছে ওঠার সময়। নৌকাটা কিছুদূর এসেই ঘুরে গেল।

নারাণ তাড়াতাড়ি লগিটা হাতে করে গলুইতে দাঁড়াল। ওরা ক্রমশ ঘাট থেকে সরে যাচ্ছে। ভুলু হাত তুলে দিতেই জানালার পাশ থেকে হেনার শীর্ণ হাতটা নড়তে থাকল। কোষা-নৌকাটা খুব দুলছে। দক্ষিণের বাড়ির নতুন-বৌ ঘাটে বাসন মাজতে এসে ওদের দেখে ফেলল।

ভুলু চুপ করেই আছে। কোনো কথা সে আর বলল না। নারাণ ভাবল ওর কথায় ভুলু রাগ করেছে। সে অনুযোগের সুরে বলল, তোর কাকীমা তোকে বড্ড খাটায় বলেই এ-কথা বললাম। দিন নেই, রাত নেই কেবল তোকে দিয়ে কাজ করাবে। বলতে পারিস না, বাড়ির চাকর নস্ তুই, এখানে তুই পড়তে এসেছিস। তিনি তাঁর নিজের ছেলেকে দিয়ে ত কোন কাজ করান না। গতবার তোর কাকীমার জন্য আমাদের যাওয়া হল না—তুই যেতে পারলি না, এবার কাঁচকলা! ধরতে পারল? আর যখন বড় একটা চাইন মেঘনা থেকে ধরে আনবি তখন দেখবি কত তোর আদর।

হারাণ বৈঠাটা জলে ছুঁইয়ে ভুলুর দিকে চাইছে।—খাবার সময় তুই কিন্তু লেজাটা পাবি।

ভুলু গলুইতে বসে হাল ধরার জন্য বৈঠা জলের নীচে ঢুকিয়ে দিল। নারাণ লগিটা পাটাতনে রেখে একটা বৈঠা নিয়ে হারাণের পাশে বসে পড়ল। ওরা আড়কাঠে বৈঠা ঢুকাল। একসঙ্গে দু'জন বৈঠা দিয়ে জলের ওপর চারি মারল এবার।

শ্রাবণের বর্ষণ শেষ হয়ে ভাদ্রমাসের বর্ষণ আরম্ভ হয়েছে। ভরা গাঙ। টলটলে জল। মাঠে জল। ঘাটে জল। পাড়ার বৌ-ঝিরা রান্নাঘরের দাওয়ায় ঘাট করেছে। জল এখন বাড়ি ছুঁই-ছুঁই করছে। ঘাটে ঘাটে এখন উজান-ভাঁটা। ট্যাংরা মাছ, পুঁটি মাছ, এলকোনার বাচ্চা ঘাটে ঘাটে মেলা বসিয়েছে। মালিনী মাছেরা তিন চোখ আকাশে তুলে ভাদ্রমাসের আকাশ দেখছে। ডে-ফল গাছটার নীচে এসে ভুলু তাকাল পশ্চিমের দিকে। কুয়োতলার পেয়ারা-গাছটা এখান থেকে এখনও দেখা যাচ্ছে। হেনা জানালায় তখনও

চুপচাপ। জানালা থেকে ওদের নৌকাটাকে দেখছে। জামরুল-গাছটার নীচে আসতেই আড়াল পড়ে গেল হেনা।

খালের দুধারে বসতি। ওরা দুটো বাড়ি বাঁয়ে রেখে কবরেজ-বাড়ির ঘাট ধরে চলতে থাকল। ঘাটের পাশে কবরেজদের লাউ-এর মাচান। মাচানের নীচে শোলের পোনা ফুটকরী ছাড়ছে।

হারাণ পোনার ঝাঁক দেখে বিস্ময় প্রকাশ করল, কি প্রকাণ্ড!

নারাণ ততক্ষণে ছোট পুঁটলী থেকে টেনে গামছা বের করেছে। পোনার ঝাঁকটা ওর ধরে নেওয়ার ইচ্ছে। সে পাটাতনে উঠে দাঁড়াল, চোখে মুখে জলের ওপর লাফিয়ে পড়বে ভাব।

ভুলু হালে বসে রয়েছে বলেই উঠতে পারল না। পোনার ঝাঁকটা মাচানের নীচ থেকে ক্রমশ ধানক্ষেতের দিকে যাচ্ছে। ভালই হল, নতুবা নারাণ এ-নিয়ে জেদ ধরত। নারাণ একরোখা মানুষ। পোনার ঝাঁকটা ফুটকরী ছাড়ছে—আর ধানক্ষেতে ঢুকছে। নারাণ হতাশ হল খুব।—কিরে ধরবি না? গামছাটা সে জলে ভিজাল।

বুড়ো মানুষের মতোই কথাটা বলল ভুলু, দামোদরদীর ঘাটে পৌঁছতে সন্ধ্যা হবে। তাড়াতাড়ি নৌকা না বাইলে সন্ধ্যায় দামোদরদী পৌঁছতে পারব না।

—রাত হলে হবে কিটা? আজ ত আর মেঘনায় উজান দিচ্ছি না।

হারাণ ভাবল অন্য কথা। অন্য কিছু ভেবে সে শিউরে উঠল। শক্ত মুঠোয় দাঁড় ধরেছে সে। নায়ের কাঠে ঘসা খেয়ে দাঁড় অদ্ভুত রকমের শব্দ করছে। যেন হারাণের মনের ভাবই বুঝিয়ে দিচ্ছে নারাণ আর ভুলুকে। বিলের হিজলগাছটা ওর চোখে মুখে একটা বিশেষ রকমের আতঙ্ক সৃষ্টি করল। হাঁমচাঁদীর বাঁকের কথা মনে করতে পারল সে। হিজলগাছটাতে যে কুষ্ঠরোগী গলায় দড়ি দিয়েছিল, তার দুটো চোখ এবং ভয়াবহ জিভটা ওকে যেন অনুসরণ করছে। পোনার ঝাঁক ধরতে গিয়ে এখানে দেরি হলে, সেখানে রাত হবে। সুতরাং রাত হলে কুষ্ঠরোগীর বীভৎস জিভটা ওকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ

করবে। হারাণ সেজন্য অন্য কথা বলল, রাত হলে কিন্তু হামচাঁদীর বাজারে নৌকা বাঁধব নারাণ।

নারাণ খেঁকিয়ে উঠল ওর কথায়, তবে ভোর রাতের উজান পাবি কি করে! সোনা শেখ, ইদা ভোরের উজানে দু'মণের মত চাইন শিকার করেছে। কাল ভোরের উজান আমাদের ধরতেই হবে। নারাণ পোনার ঝাঁকের কথা বেমালুম ভুলে গেল। ভুল্ খাল থেকে জল নিয়ে এক গণ্ডূষ জলে মুখটা ধুল।

গ্রামের শ্মশানটাকে ওরা ডানদিকে ফেলে চলল। শ্মশানের পুরানো মন্দিরটায় একজন সাধু-ভিখারী থাকেন। তিনি দিনরাত মন্দিরা বাজান। চাতালে বসে গান করেন। মন্দিরের চাতালে এখন বর্ষার জল। সাধু-ভিখারীর চোখে জল। হাতের মন্দিরাটা বাজছে। গ্রামের এই শেষপ্রান্তে বিকেলের পড়ন্ত রোদে এক অদ্ভুত মনোরম পরিবেশের ভিতর ভিখারী গান ধরেছে, নাও নিয়ে তুমি কোথায় যাও···। ঘুঘু ডাকল। শালিখ ডাকল। গাংশালিখেরা শাপলা-পাতার আশেপাশে ভিড় করেছে। বালি-হাঁসের ঝাঁক নেমেছে শাপলাশালুকের দেশে। ধানক্ষেত থেকে ডাক উঠছে কোড়ার। কোড়াগুলোর ডিম-পাড়ার সময় হয়ে গেল।

খালটা গিয়ে মেঘনায় পড়েছে। খালের দুধারে ধানক্ষেতের জমি। জমিতে জমিতে পাট কাটা হচ্ছে। খাল ধরে সনকান্দার মাঝি-মাল্লারা, মোল্লা-মৌলবীরা উল্টো দিকে যাচ্ছে। ওরা যাবে আলিপুরার বাজারে।

পাটজমিতে এখন বুকজল-গলাজল। ধানজমিতে লগিজল। জমিতে জল বেশী বলে ঠাঁই নেয় না মানুষের। সোলেমান মিঞার ভাতিজা-রা ডুবো-জমিতে পাট কাটছে। ওরা পাট কেটে ভেসে উঠছে শুশুক মাছের মতো। লগিতে ওদের নৌকা বাঁধা আছে। খড়ের বীড়া জ্বলছে নৌকার পাটাতনে। সোলেমান মিঞার নাতি বছর পাঁচেকের বাচ্চাটা গলুইতে চুপচাপ বসে তামাক টানছে গুড়ুক-গুড়ুক। বাপ-চাচারা উঠে আসছে। শীতে থরথর করে

কাঁপছে তারা। সোলেমান মিঞার নাতি হুঁকোটা বাড়িয়ে ধরল এবার। বড় ভাতিজা হুঁকো টানতে টানতে বলল, রাঙ্গাঠাকুর যাবেন কোথা ?

—ঢাইন-শিকারে যাচ্ছি। তোমরা এবার শিকারে যাবে না ?

মাথা নেড়ে বড় ভাতিজা প্রথম না করল। পরে বলল, আপনারা ছোট মানুষ বড় ঢাইন ধরতে পারবেন ত ?

—পারব না ? কি যে বল ! নারাণ খুব লঘুস্বরে জবাব দিল।

ওরা তিনজন এবং নৌকাটা ক্রমশ দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। ওরা খাল ধরে গাঙে চলেছে। ধানের জমিগুলো দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। এখনও বর্ষার জলে সোলেমান মিঞার নাতিকে দেখা যাচ্ছে, লগি ধরে উবু হয়ে সাঁতার কাটছে ব্যাঙের মতো। একটা শ্যাওড়াগাছ পার হল তারা। মাঠের সব পিঁপড়ে শ্যাওড়াগাছটায় জড়ো হয়ে আছে। ঘন পাতার আড়ালে পিঁপড়েরা বাসা বেঁধেছে। পাতা এত ঘন যে শঙ্খিনীরা পর্যন্ত অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে। লুকিয়ে লুকিয়ে পিঁপড়ের ডিম খায়। সময় সময় লগির শব্দে জলে লাফিয়ে পড়তে গিয়ে নৌকায় লাফিয়ে পড়ে। এসব ভয় নারাণের নেই। একটা শঙ্খিনী সে অনেকদিন থেকে চাইছে। মাছের রাজা হতে গেলে শঙ্খিনীর হাড় লাগে। গলায় হাড়ের মালা পরতে হয়। নারাণের ভয় সেজন্য কম। মনে মনে এখন সে একটা শঙ্খিনীকেই খুঁজছে।

নারাণ বৈঠা থামিয়ে সোজা হয়ে বসল। বলল, চল শ্যাওড়া-গাছটার নীচে আবার ফিরে যাই। পাতার আড়ালে শঙ্খিনী থাকলে মারব। ডেঙ্গুরা-জ্যাঠার মতো শঙ্খিনীর হাড় গলায় পরে মাছের রাজা হব ভাবছি।

ভুলু জলের ভেতর বৈঠা ঘুরিয়ে দিল। খালের বাঁকে নৌকার মুখ ঘুরিয়ে দিল। এখানে অনেক শাপলা ফুল। অনেকগুলো জল-ফড়িং শাপলাফুলের চারদিকে উড়ছে। ভুলু জল থেকে শাপলা তুলে বলল, শ্রাবণ মাসে মনসার বাহনকে মারতে নেই, তবে তিনি রাগ করেন।

হারাণ বলল, সাপের সঙ্গে এখন মশকরা কর না, করলে তোমার চোদ্দপুরুষের নাম ভুলিয়ে দেবে।

—ফুঃ! নারাণ, হারাণকে ব্যঙ্গ করল।—টুসটুসির বাচ্চা চামচিকে কোথাকার! কি করতে আমার সঙ্গে এতদিন আছিস। গতবার দামোদরদীর বিলে কচ্ছপ ধরতে আমার সঙ্গে তুইও গেছলি। তুই চামচিকে বলেছিলি সাপটা মরল না, রাতে চুপি চুপি এসে আমাকে কামড়াবে। কই, সেবার সাপটা আমাকে কামড়েছিল!

ভুলু জলে বৈঠা মেরে বলল, তেমন সাপের সং জীবনে কখনও দেখিনি।

হারাণ চুপচাপ থাকল। সাপ নিয়ে ঝামেলা ওর পছন্দ নয়। গতবারের কচ্ছপ শিকারের সেই জোড়-সাপের কথা স্পষ্ট মনে করতে পারছে সে। ওর আবার ভয় ধরেছে। দামোদরদীর বিলের ভয়াবহ দৃশ্যটা চোখের ওপর ভাসছে। দামোদরদীর বিলে ওরা তিনজন। ভোর রাতের অন্ধকারে গ্রাম থেকে একটা বাঁশ, একটা পাটের থলে, বাঁশের ফালা নিয়ে ওরা দামোদরদীর বিলে গিয়েছিল খালের জলে কচ্ছপ ধরতে। বিল পার হলে মেঘনা। মেঘনার তীরে দু'পহর বেলায় ডালভাত রেঁধে খেয়েছিল। সময়টা ছিল কার্তিক মাস, ধানের ভারে গাছগুলো সব মাটিতে শুয়ে পড়েছে। বিলের জল খাল ধরে মেঘনায় নামছে। জমির উপর ধানগাছের চাপ বাড়ছে ক্রমশ। বিলের জল ক্রমশ কমছে। ধানগাছের নীচে জল নেই আর। নারাণ এই ধরণের অনেক খবর রাখে। কার্তিক মাসে কচ্ছপগুলো খালের জল ধরে মেঘনায় নামে সে এ-খবরও রাখে। সেজন্য খালের এ-ধার থেকে সে-ধার ফালা পুঁতেছিল নারাণ।

নারাণ জানে কচ্ছপগুলো একসময় জলের নীচে ফালার গুঁড়িতে এসে মাথা ঠুকতে থাকবে। কিন্তু সবখানটাই ফালা দিয়ে বন্ধ। কচ্ছপেরা তখন ডাঙার দিকে উঠতে থাকবে। নারাণ হারাণকে খুব হুঁসিয়ার হয়ে অন্য তীরে বসতে বলেছিল।

রাত। জ্যোৎস্না রাত। রাতের গভীরতা বাড়ছে। প্রথম কচ্ছপটা নারাণের পায়ের কাছ দিয়েই উঠে আসছে। নারাণ তখন শিকারীর মতো হুঁসিয়ার। কচ্ছপটা ডাঙার দিকে উঠে গেলে নারাণ তাকে অনুসরণ করল। ভুলু পিছনে সন্তর্পণে হাঁটছে। কিছুদূরে নারাণের সঙ্গে কচ্ছপটার লড়াই হচ্ছে। শব্দটা হারাণকে ওপারে যাওয়ার জন্য ডাকছে। ভুলু কাছে গিয়ে বুঝল নারাণ কচ্ছপটাকে আয়ত্তে এনেছে। কচ্ছপটার বুকে একখণ্ড মাটি দিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। এখন সে নিশ্চিন্ত ; পাটের থলেটার জন্য সে অপেক্ষা করছে। নারাণ চারিদিকে চাইল। বিচিত্র এক শব্দে সে বিস্মিত হল। ভুলু তখন হারাণকে ডাকছে, ছুটে আয় হারাণ, সাপের সং দেখবি আয়।

হারাণ ছুটতে সাহস পেল না। পা দুটো মাটিতে শক্ত হয়ে যাচ্ছে। সে ভুলুর পিছনে কোনরকমে হেঁটে হেঁটে গেল। সাপ দুটোকে সে গলা বাড়িয়ে দেখল। ওরা জড়াজড়ি করে সং খেলছে। হারাণ জানে সাপদুটোর এ সং দেখানোর অর্থ কি। সে জানে এবং দেখেছে বাড়ির পাশে সাইতানগাছের নীচে দুটো সাপ সং ধরেছিল। সাপ দুটো ছিল কালোপানস। সকলে ভয় পায়—ভয়ানক সাপ। ঝব্বর ওঝা পর্যন্ত বলেছিল, এ-সময় যন্ত্রণা দিতে নেই ওদের। ওদের এখন মিলন হচ্ছে। ছোট সাপটা ডিম পাড়বে। ঝব্বর এত বড় ওঝা সাপের মেয়ে-পুরুষ পর্যন্ত চেনে।

নারাণ ততক্ষণে ছুটে গিয়ে ফালা থেকে বাঁশ খুলে আনল। সে সাপ দুটোর মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াল। একটা বাড়ি অন্ততঃ সে দেবেই।

ভুলু নারাণকে ডেকে বললে—এ সময় ওদের মারতে যাস্ না। ওদের এখন যন্ত্রণা দিতে নেই। ভুলু তার বাবার কথা মনে করতে পারল এবং মাকে মনে করতে পারল।

—কি হয় যন্ত্রণা করলে ?

—করতে নেই, বললাম।

—আমি করব, দেখি আমার কি হয়। নারাণের জিদ চড়ছে।

হারাণ দূর থেকে বলল, জানিস এ-সময় ওদের ডিম হবে। পুরুষ-সাপটা সং খেলে চলে যাবে অন্য মেয়ে-সাপের সঙ্গে আবার সং ধরতে। আর মেয়ে সাপটা গিয়ে গর্তে ঢুকবে। যতদিন না ডিম হবে, বাচ্চা হবে, ততদিন সে আর গর্ত থেকে বের হবে না।

নারাণ মনে মনে ভাবল, তাহলে আরো ভাল হল। অনেকগুলো সাপ একসঙ্গে শেষ হবে।

দামোদরদীর বিল পার হয়ে খংসারদীর বটগাছটার মাথায় তখন এক ফালি ভাঙা চাঁদ উঠেছিল। দক্ষিণ দিক থেকে বাতাস আসছে। কোথাও কাছে আনারসের বাগান ছিল। সেখান থেকে আনারসের গন্ধ আসছে। দূরে আখক্ষেতের ভিতর শিয়াল ঢুকেছিল, এই আলো-আঁধারে দাঁড়িয়ে তারও শব্দ পাচ্ছিল ভুলু। কিন্তু ওর চোখদুটো সাপদুটোর ওপর। ওদের ডিম হবে। একটা সাপ মা, একটা বাবা —ভাবতে ভালো লাগল। সে বললে, নারাণ সাপদুটোকে মারিস না। ওরা খেলছে খেলুক। আমরা চল্ চলে যাই।

নারাণ বিরক্ত হয়েছিল ওর কথায়।

হারাণ এক পাও নড়ল না। সকলের পিছনে সে আছে, সুতরাং সাপদুটো তাকে কামড়াবে না। যদি ছোবল দেয় প্রথমে নারাণকেই দেবে। পরে ভুলুকে। কি দরকার বাপু ওর পিছনে পিছনে যাওয়ার!

ভুলু বললে, নারাণ যাস্ না সাপদুটোর সামনে। ওদের খেলতে দে। আয় দূরে দাঁড়িয়ে আমরা দেখি। কি অদ্ভুত খেলছে দেখ! সাপদুটো কি সাপ রে?

আলো-আঁধারে সাপ দুটো চেনা যাচ্ছে না। কিন্তু বিষধর সাপ সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। ওরা বড় বেশী ফোঁস ফোঁস করছে। নারাণ মুহূর্তের জন্য থামল। সাপদুটোকে চেনার জন্য মুখ বাড়াল। ভুলু নারাণের হাতের বাঁশটা চেপে ধরল সে সময়।—জানিস, বাবা আমাকে বলেছেন কাউকে যেন কোন আঘাত না করি। সাপদুটো

আমাদের কিছু বলেছে? ওদের মতো ওরা সং খেলছে খেলুক। ওদের জগতে ওরা থাক।

খেঁকশিয়ালটা যখন আখক্ষেত থেকে বের হয়ে খালের পাড় ধরে ধরে ফিরছিল তখন নারাণ বলেছিল, বাঁশটা তুই ছেড়ে দে, আমি কিছু করব না। ভুলু বাঁশটা ছেড়ে দিতেই হারাণ আরো দু পা পিছনে সরে গেল। সে নারাণের মনের ভাবটা বুঝতে পেরেছে। নারাণ কসে ততক্ষণে একটা বাড়ি বসিয়েছে সাপের মাথায়। একটা সাপ ঘাসের ওপর লুটিয়ে পড়েছে, অন্য সাপটাকে তারা আর দেখতে পেলে না। ভুলু বলল, এই তোর কিছু না-করা।

নারাণ বোকার মতো হাসতে থাকল। সাপটাকে লাঠির ওপরে তুলে বলল, দেখ কত বড়! এত বড় সাপ তোরা কোনদিন মেরেছিস?—হ্যাঁ রে, এযে দেখছি শঙ্খিনী সাপ। নারাণ তাড়াতাড়ি সাপটাকে পেঁচিয়ে নিয়েছিল লাঠির ডগায়। ডেঙ্গুরে জ্যাঠার সেই শঙ্খিনী সাপের মালার কথা মনে পড়েছিল। কিন্তু পূর্ণিমা কিংবা অমাবস্যা না হওয়ায় সে রাতে তার আফসোসের অন্ত ছিল না।

খালের ধারে ওরা তিনজনই শুনেছিল দূরে সেই খেঁকশিয়ালটা কড় কড় শব্দ করে কিছু খাচ্ছে। হয়ত কাঁকড়ার ঠ্যাং, নয়ত কচ্ছপের ডিম। শিয়াল আর গোসাপগুলোর জন্য খালের ধারে কচ্ছপের ডিমগুলো মানুষের হাতে পড়বার জো নেই। হারাণ পাটের থলেটা কাঁধে ফেলে বলল, এত বড় মদ্দ যখন, তখন দুটো একটা গো-সাপ, শেয়াল, খটাস মারলেই তো পারিস। গণ্ডা কয়েক কচ্ছপের ডিম তবে আমরা পেতে পারি অন্ততঃ।

ভুলু ওদের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে খালের দিকে যাচ্ছে। সাপদুটোর সং দেখে ওর যেমন আতঙ্ক হয়েছিল তেমন আনন্দও হয়েছিল।

খালের পারে পৌঁছে হারাণ বলল, নারাণ আমি থাকছি না, আমি এক্ষুণি বাড়ি ফিরে যাব।

—অনায়াসে। আমরা কি তোকে ধরে রেখেছি?

—তোরা না গেলে একা যাব কি করে?

—খাবার জন্য ত আসিনি। কচ্ছপ শিকারে এসেছি।

—কিন্তু সাপটা যে রাতের অন্ধকারে কামড়াতে আসবে।

—সাপের খেয়ে-দেয়ে আর কাজ নেই।

—তুই জানিস না নারাণ ওরা আঘাত পেলে পাল্টা আঘাত করে। যে-সাপটা পালিয়ে গেল ও এসে নির্ঘাত রাতের অন্ধকারে ছোবল মারবেই।

—মারবে, বেশ করবে। নারাণ সে-রাতে হারাণের সঙ্গে ফের কথা বলতে লজ্জা বোধ করছিল। হারাণ একটা আস্ত মোরগের ছাও। পাটের থলেটা ঘাসের ওপর বিছিয়ে নারাণ এবার বসে পড়ল। কার্তিক মাসের রাত্রি। ঘাসের ওপর হিম পড়েছে। পাটের থলেটা হিমের জলে ভিজে যাচ্ছে। ওর প্যান্ট ভিজে উঠ' তবু সে উঠল না, ফণাটা নড়ছে কিনা সন্তর্পণে দেখছে। সে : মনে হেসে কুল পেল না—সাপটা হয়ত ভয়ে এখন বিল সাঁ আনারসের জঙ্গলে ঢোকার জন্য পাগল, আর কিনা হারাণ সেই কাতরাচ্ছে। নারাণ গলায় অভয়ের সুর টেনে বলল—ভয় নেই হারাণ আমার পাশে বোস।

তারপর নারাণ ভুলু চুপচাপ বসে রয়েছিল ফালাটার পাশে। কথা বলে নি, আলো ধরায় নি। মশার কামড়ে অস্থিরচিত্ত হয় নি। কিন্তু বাঁশের ফালাটা আর একবারের জন্যও নড়ল না। ওদের হৈ চৈ শুনে কচ্ছপগুলো সেই যে বিলে উঠে গেল আর এসে বুঝি মেঘনায় নামল না। সাপটাও রাতে এসে কোনো অঘটন ঘটাল না বলে হারাণ ভাবল, এ-যাত্রার জন্য তারা অন্ততঃ বেঁচে গেল। নারাণ ফের সেই গত সালের মতো সাপ নিয়ে মশকরা করতে শুরু করেছে। এবার বলতে ইচ্ছে হল, বলবে নাকি, আমি ঢাইন শিকারে যাব না নারাণ। তোরা একা একা যা। শঙ্খিনীর হাড় নিয়ে পাগলামি আরম্ভ করিস ত এখানেই আমার যাওয়া শেষ। কিন্তু হারাণ কিছুই বলতে পারল না। সে দেখল, ততক্ষণে ওদের নৌকাটা আস্তানা-সাহেবের দরগার পাশ দিয়ে চলেছে। এখন আর খাল

ধরে নৌকা চলছে না। ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে নৌকা যাচ্ছে। অনেক কীট পতঙ্গ, গঙ্গা-ফড়িং নৌকার পাটাতনে সবুজ হয়ে বিছিয়ে আছে।

ধানক্ষেতে ভাদ্রমাসের নিড়ান পড়েছে। জলের ওপর ধানের পাতা বর্শার মতো। পাতাগুলো নড়ছে না। এতটুকু বাতাস নেই। গ্রামের ছোট বড় মাতব্বর-গোছের মানুষেরা কোচ, একহলা নিয়ে নৌকায় বের হয়েছে মাছ, কচ্ছপ শিকার করতে।

কিছু বলতে গিয়ে হারাণের দাঁত শক্ত হল। সে বেশ জোর দিয়ে বলল, একটা চাইনমাছ যদি পাই তবে আস্তানা-সাহেব তোমার দরগায় মোমবাতি জ্বালব।

—তুই বড় স্বার্থপর হারাণ। মাছ পেলে জ্বালবি, না-পেলে তু' জ্বালবি না। হারাণকে কোনো জবাব দিতে না দেখে কপালে হাত ঠেকিয়ে ভুলু আস্তানা-সাহেবের উদ্দেশে প্রণাম জানাল। সাগর দেবতা এই দরগার পীর। ঠাকুমা পিসিমার মুখে শুনেছে রোজ তিনি খড়ম পায়ে দিয়ে গ্রামটাকে প্রদক্ষিণ করেন। ঠাকুমা ওকে গল্প বলেছে আস্তানা-সাহেবের। রাত-বিরেতে ভয় ধরলে আস্তানা-সাহেবের নাম নিবি। গরুটা হারিয়ে গেলে ভুলু কত রাতে লণ্ঠন হাতে গরুটাকে খুঁজতে বের হয়েছে আর বলেছে, আস্তানা-সাহেব আমি ছোটমানুষ, আমি যেন ভয় না পাই। গরুটা আমায় দেখিয়ে দাও। গরুটা খুঁজে না নিয়ে গেলে ঠাকুমা আমায় বকবে। বলবে তুমি তোমার বাড়ি চলে যাও। অকর্মার ধাড়ী! আর সেই সময় ভুলু দেখেছে আঁধার মাঠে সাদা গরুটা ঘাস খাচ্ছে খুঁটে খুঁটে। লণ্ঠন হাতে সে তখন ডাকত—আয় আয়! গরুটা পরিচিত গলার স্বর শুনে ছুটে আসত। সেই আস্তানা-সাহেবকে কিনা হারাণ সামান্য একটা মোমবাতি জ্বেলে ভোলাতে চায়। হারাণ কেমন অবুঝের মতো কথা বলছে।

ধানক্ষেতের ভিতর বৈঠা চলবে না। ওরা বৈঠাগুলো ভাঁজ করে পাটাতনের একপাশে রেখে দিল। নারাণ লগি তুলে ভর দিল নৌকায়। সে গলুইতে দাঁড়িয়ে লগি মারছে। খালে খালে গেলে দেরি হবে। বেশ রাত হবে দামোদরদী পৌঁছতে। ধানক্ষেতের

ওপর দিয়ে গেলে ওরা সকাল সকাল দামোদরদী পৌঁছবে। নারাণের এ-পথ মুখস্থ। প্রথমে এই মাঠ, পরে ভৌমিকদের ঝিল। আমবাগান, মেতিকান্দার বাঁক, খংসারদীর পুল, বড় বটগাছটার পাশ দিয়ে হামচাঁদি ডাইনে ফেলে দামোদরদীর বিলে পড়তে হবে। তার-পরই বিশাল মেঘনা, উত্তাল মেঘনা। এ-কূল থেকে ও-কূল দেখা যায় না। নারায়ণগঞ্জ থেকে বারদী গোপালদী আরো উত্তরে। কত স্টীমার, গয়না-নৌকা, পাট কাঁঠালের নৌকা, আনারসের নৌকা সারি সারি চলে যাবে তার ইয়ত্তা নেই। নারাণ দামোদরদীর হাটে বর্ষাকালে কতবার গিয়েছে, দেখেছে। কিন্তু দেখে দেখে আশ মেটেনি।—তুই স্টীমার দেখেছিস ভুলু? নৌকা বাইতে বাইতে হঠাৎ ভুলুকে প্রশ্ন করে বসল নারাণ।

—না দেখিনি।

—তোর কাকীমা বছরে এতবার ঢাকা যায়, একবার নিয়ে যেতে পারে না তোকে? নিয়ে যায় না বলে রাগটা যেন নারাণেরই বেশী। নিয়ে গেলে ঢাকা শহরটা ভুলু দেখে আসতে পারত। সদরঘাটের কামান দেখে সে খুশী হত।—ভুলু ঢাকা গেলে চাকরের মতো বাড়িতে খাটবে কে!

একটা ধানের পাতা ছিঁড়ল ভুলু। হারাণ বসে বসে বঁড়শিগুলোতে গিঁঠ দিচ্ছে। হাঁটু বিছিয়ে টোন সূতায় যেখানে পাক কম সেখানে পাক দিতে দিতে হারাণ বলল, পরের বাড়িতে থাকে, দুটো খেতে দেয় এই ত বেশী···

—দুটো খেতে দেওয়ার নামে দিনরাত খাটাবে! ভোরে ওকে পড়তে দেবে না সেজন্য!

এ-সব কথার ভিতর ভুলু কোন সময়ই থাকে না। সে অন্য কথায় যেতে চাইল। বলল—গতবার কলিমদ্দি মেঘনায় দু-মণের মতো একটা চাইন ধরেছিল। যদি আমাদেরটা তেমন হয়। মেঘনায় নাকি এর চেয়েও বড় চাইন আছে। কলিমদ্দি ঠাকুমার কাছে সে-গল্প করে একসের চাল ধার নিয়ে গেছে।

—তোর ঠাকুমা বড় কিপ্টে। আমি তেমন গল্প শুনলে একমণ চাল দিয়ে দিতাম। ঘর থেকে দিতে না পারলে চুরি করে দিতাম।

ভুলু জানে নারাণ অনায়াসে তেমন কাজ করতে পারে। স্কুল থেকে ফিরতে ফুলবাগের সব আম সে একরাতের ভিতর নষ্ট করেছিল। একদিন একটা আম ঢিল দিয়ে পাড়ায়, ফুলবাগের মালিক কুতুব মিঞা নারাণের কান ধরে বলেছিল—তোমার বাজীকে না বলেছি ত আমার হজে যাওয়া বৃথা।

—ঠিক আছে। নারাণ সেদিন ছটো মাত্র কথা বলে চলে এসেছিল। ক' দিন পর স্কুল থেকে ফিরতি পথে ফুলবাগে সে রাত কাটাল। এবং বাঁদরের মতো সব আম পেড়ে কামড়ে ভোর রাতে একা ঘরে চলে এসেছিল। কাউকে সঙ্গেই নেয়নি, এ-সব কাজে কারো প্রয়োজন তার বড় একটা হয় না।

নারাণ লগিতে আর ভর দিল না। ভৌমিকদের ঝিল দেখা যাচ্ছে। এখানে আবার বৈঠা চলবে। বৈঠা মেরে অনেকদূর পর্যন্ত যাওয়া যাবে। ভৌমিকদের আমবাগানে গিয়ে আবার লগি ধরতে হবে। ভুলু হালে চলে এল। নারাণ ওকে বেশী খাটাতে চায় না। পরের বাড়িতে সে থাকে—সুখ-দুঃখ কেউ বোঝে না।

ভুলু যদি নারাণের মনের কথাটা জানতে পারত তবে বলত, না, এ কথা তুমি বল না। হেনা আমার সুখ-দুঃখ বোঝে। কাকা ছুটিতে বাড়ি এলে আলুর রসপুলি হয়। হেনা চুপিচুপি পাতা-বাহারের ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে ডাকে, দাদা এখানটায় আসিস। সামনে গেলে আমায় হাঁ করতে বলে। তখন দুটো রসপুলি আমার মুখে দিয়ে হেনা দুটো খায়। ওর ভাগের বরাদ্দ দু ভাগ হয়। কিন্তু সেই হেনার যে কি হল! দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। ভুলু মাঝে মাঝে তার ভগবানকে বলে, ভাল মেয়েটার ওপর তোমার এমন নজর কেন! ওর ধারণা যারা ভাল তাদের ভগবান খুব দুঃখ দেন না। এইসব ধারণাগুলো সে নিজে গড়ে তোলে নি—বাবা তার জীবনে গড়ে

দিয়েছেন। কারো অপকার চিন্তা করতে নেই, সকলের উপকার করবে। ঈশ্বর তোমার ওপর খুশী হবেন।

আকাশে অনেক রঙ। রঙের খেলা। নীল লাল মেঘে আকাশ কেমন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ঝিল পার হলে আবার সবুজে সবুজে ছেয়ে যাবে মাঠ। ওখানে ধানক্ষেত আর জল। জলের নীচে পুঁটি-মাছগুলো ধানগাছের শেওলা খাচ্ছে। জলপিপিগুলো জলের ওপর শাপলা পাতার বুকে লেজ উল্টে ধানের ফড়িং খাচ্ছে। জল-পায়রারা ফিরছে বামুনের চক থেকে। ওদের মুখে খড়কুটো। ওরা বাসা বানাবে।

হারাণ বৈঠা মারছে, নারাণ বৈঠা মারছে। পোদ্দার বাড়ির পানসী-নৌকায় শ্বশুরঘর থেকে বাপের ঘরে যাচ্ছে নতুন বৌ। নৌকার পাটাতনে গ্রামোফোন বাজছে। ধুতুরাফুলের মতো চোঙের মুখে গান। ভাটিয়ালী গান। গান শুনলে ভুলুর মন উন্মনা হয়, অন্য এক জগতে সে বিচরণ করে। হেনাকে অনেক দিন সে-জগৎ সম্বন্ধে খবর দিতে চেষ্টা করেছিল—কিন্তু অনেক হাত পা নেড়েও সে কিছুই হেনাকে বোঝাতে পারল না। তবু তার এই মাত্র ইচ্ছা হল বড় হলে এমন একজনকে নিয়ে সে মেঘনা-পদ্মা পাড়ি দেবে, নদীতে নৌকা চলবে, গ্রামোফোনে গান হবে, বড় টাকামাছ কিনবে তীরের কোন বাজার-হাট থেকে—লগি পুঁতে, লণ্ঠন জ্বেলে পাটাতনে বসে লণ্ঠনের আলোয় সে তার সঙ্গে ভাত খাবে।

এগুলো তার চিন্তা, এগুলো তার কিশোর মনের প্রত্যাশা। এমন অনেক প্রত্যাশার হাতছানির খবর সে পায় আজকাল। সে স্পষ্ট বুঝতে পারে না—কারা, কেমন করে নতুন নতুন খবর তার কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। বিকেলের পড়ন্ত রোদে ঝিলের ওপর এক্কোনা মাছের ঝাঁক দেখতে দেখতে ভাবে—কত প্রাচুর্য আসছে জীবনে! সব কিছু সুন্দর, সব কিছুর ভিতর অপূর্ব এক রহস্যের ছোঁয়াচ। নারাণ হারাণ এগুলো অনুভব করতে পারে কিনা সে জানে না, আলো-অন্ধকারে কোন এক গভীর অনুভূতিতে

হৃদয়ে শিহরণ জেগেছে কিনা তাদের, সে তাও জানে না—তবু ওদের মুখ দেখে, মন দেখে সে যেন বুঝতে পারে ওরাও সেই রহস্যের টানেই মেঘনায় গিয়ে নামছে।

জলপিপি-জলপায়রা, কালো-বক, গাং-শালিখ, বুনোহাঁস ওরা সব পাখি, পাখির জগৎ। কিন্তু ভুলু ঝিলের বুকে হাল ধরে যখন আকাশের দিকে চায়, তখন বুঝতে পারে বুনোহাঁসেরা আকাশের যে প্রান্ত ধরে চলেছে, জলপায়রা সে প্রান্ত থেকে অনেক দূরে পল্টন খেতে খেতে নীচে নেমে আসছে। সকলের স্বতন্ত্র জগৎ। শাপলা আর পা তশাপলা ফুল আলাদা। ওর সেই লণ্ঠনের আলোয় আর একজনের মুখ সকল থেকে ভিন্ন। কিন্তু সব মিলিয়েই তার জীবন-রহস্যের অখণ্ডতা যেন। সে সেই অখণ্ডতাকে বুঝেও বুঝতে পারে না, ধরেও ধরতে পারে না। এমন কেন হয়! অথচ তার যেন মনে হয় লণ্ঠনের আলোয় আর একজনের মুখ, ঘাট থেকে বড় টাকামাছ কিনে লগি পুঁতে নৌকার গলুইতে বসে খাওয়া, নদীর জল, মেঘনা, আকাশ, ছুটো জলপায়রার পল্টন না হলে তেমন রোমাঞ্চকর হ'ত না। জলপায়রা যদি বাসা বাঁধবার খড়কুটো নিয়ে নীল আকাশের নীচু দিয়ে উড়ে না যেত—এই শেষ-বিকালে ঝিলের রূপালী জলে এলকোনা মাছের ঝাঁক দেখতে এমন অপরূপ হ'ত না। এইসবগুলো সে বুঝতেও পারে ধরতেও পারে। তবু ওর মনে হয় এই অখণ্ড ছবির কোথায় যেন অস্পষ্টতা—তা সে ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারছে না, হারাণ এবং নারাণকে বলতে পারছে না। ওর চোখে মুখে ক্রমশ একটা বেদনার ছাপ ফুটে উঠছে।

ঝিলের রূপালী জল বিন্দু বিন্দু হয়ে এখন বাতাসে উড়ছে। বৈঠা পড়ছে ছপছপ। হারাণ নারাণ একবার উঠে ঝুঁকছে আবার দাঁড় টানতে চিত হয়ে পড়ছে। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে ওদের মুখে। পড়ন্ত রোদে নারাণের মুখ লাল। হারাণের মুখটা কেমন কালো কালো। তরতর করে নৌকা ছুটছে বিলের বুকে। কোথাও কোন শব্দ নেই। শুধু পাখিরা ডাকছে, ধানগাছের কীটপতঙ্গগুলো

অশ্ব গাছে উড়ে পড়বার জন্য ঝুঁকছে। কোড়ার শব্দ এখানে নেই। পোদ্দার বাড়ির পানসী-নাও এখন বাদাম চড়িয়েছে নৌকায়। ওদের পালে বাতাস ধরেছে। গ্রামোফোনে গান বাজছে না, কিংবা বাতাসের জন্যই গান ওরা শুনতে পাচ্ছে না। ফুলবাগের কেউগাছটার নীচু দিয়ে ক্রমশঃ দক্ষিণে পানসী-নৌকা ব্রহ্মপুত্রের দিকে ছুটছে। হয়ত আলিপুরার কাছে গিয়ে নদীতে পড়বে। পঞ্চমীঘাট বাঁয়ে ফেলে মহজমপুরের ঘাট পার হবে। নতুন বৌ নদীর জলে মুখ দেখবে। পাড়ার বৌ-ঝিরা পোদ্দার-বাড়ির পানসী-নাও দেখেই চিনবে, পোদ্দারের ছোট ছেলের বৌ বাপের-বাড়ি যাচ্ছে। প্রতি বছর এ-দিনে নাইয়র যায় ছোটবৌ। ভুলু, হেনার কথা ভাবল। বিয়ের পর হেনাও বাপের বাড়ি নাইয়র আসবে। বাপের বাড়ি নাইয়র এসে ওকে শ্বশুরঘরের সুখ-দুঃখের কথা বলবে।

সামনে মেতিকান্দার বাঁক। এ-বাঁক ভাঙতে ওদের অনেকক্ষণ সময় নেবে। হয়ত সন্ধ্যে হয়ে যাবে। নারাণ এতক্ষণ পর কথা বলল, ছ মাইলের উজান দেব—কি বলিস ভুলু? ছোট উজানে কাজ হয় না। ঈদা, সোনা শেখ গতবার ছ' মাইলের উজান দিয়েছে। বৈদ্যের বাজার থেকে বারদী পর্যন্ত উজান টানব।

ভুলু গলুইতে বসে কলিমুদ্দির মুখটা ভাবতে পারল। সোনা শেখ, ঈদা, পেনা কাকার বয়সী। ওরা বড়মানুষ। ওরা যা পারে নারাণ ভুলু তা পারে না। ভুলু তার জন্যই জবাব দিল, ছ মাইলের উজান ওরা বাইতে পারে, তার জন্য আমরা পারি না।

—কি যে বলিস! নারাণ কথায় চটুলতা প্রকাশ করল।—অমন কত উজান পার করব জীবনে।

নারাণকে খুশী করার জন্য হারাণ চুটকি কাটল, নারাণ অবশ্য বললে সব করতে পারে। আমিও অনায়াসে পারি।

ভুলু এখন একটি বিশেষ আশঙ্কাতে ভুগছে। যদি বঁড়শিতে মাছটা আটকে যায় (দু'মণ হয়ত হবে মাছটা, আরো বেশী করে ভাবতে ইচ্ছে হল ওর) তবে এত বড় মাছটা নৌকায় তুলবে

কি করে। কিংবা মাছটাকে আয়ত্তে আনা হবে কি করে। ওকে বিষণ্ণ দেখাল। মুখ তুলে দেখল মেতিকান্দার বাঁক ধরে নৌকাটা গাঁয়ের ভিতর ঢুকছে। দেওয়ানজী-বাড়ির পুকুরপাড়ের বিলিতী গাবগাছে দুটো ছেলে। ওরা চুরি করে গাব পাড়ছে। গাছের নীচে নৌকা ঢুকলে হারাণ বলল, এই আমাকে একটা দে। তা না হলে বলে দেব।

নারাণ বিরক্ত হল।—হারাণ তোকে আমার দলে রাখতে লজ্জা হয়। ভয়ে ভয়ে ওরা চুরি করছে, তার ওপর তুই ভয় দেখাচ্ছিস—তুই বলে দিবি সে লগিটা হাতে তুলে নিল। ওদের লক্ষ্য করে বলল, এই গাব দিস তো তিনটে দে, কাউকে বলব না। না দিলে লগি দিয়ে খোঁচা মারব।

ছেলেদুটো ডালের ফাঁক থেকে উঁকি দিয়ে জোড়হাত করল। হনুমানের মত চোখ পিটপিট করছে, হাত জোড় করে ক্ষমা চাইছে। কিন্তু নারাণকে লগিটা ওপরে তুলতে দেখে ওরা তাড়াতাড়ি কোঁচড় থেকে তিনটি গাব নারাণের মাথায় ঢিল মারার মত করে ছুঁড়ল। নারাণ তিনটিই ক্যাচ ধরেছে। নারাণের ক্যাচ ধরার ক্ষমতা দেখে ছেলেদুটো খুশী হল। এবার ওরা খুশী হয়ে আরো তিনটে দিয়ে নারাণের বন্ধুত্ব চাইল। বিলিতী গাবগুলো খুবই পাকা। লাল। সিঁদুরের মত লাল। খেতে বেশ আরাম লাগছে। নৌকাটা ফের চলেছে। ভুলু একটা খেয়ে অন্যটা রেখেছে হেনার জন্য। হেনা দেখে খুশী হবে, খেয়ে আরো বেশী খুশী হবে। কিন্তু সে ভাবল অন্যভাবে—দেখে খুশী হওয়ার দাম বেশী, না খেয়ে খুশী হওয়ার দাম বেশী। নারাণকে সহজভাবে প্রশ্ন করল, মাছ ধরে আরাম, না খেয়ে আরাম।

নারাণ জবাব দিল, ধরেও আরাম, খেয়েও আরাম।

হারাণ বলল, খেতেই আমার বেশী ভাল লাগে। ধরার কষ্ট আমার সহ্য হয় না। মধুর চাক ভেঙে যা কষ্ট। তবু এ কষ্ট সইতে হয়, নতুবা কে আমাকে মধু দেবে। মধু বিক্রি করে সাত টাকা দশ আনা জমিয়েছি। নারাণ তুই?

—আমার কিছু ধার হয়েছে। মধুর সঙ্গে মুড়ি। মুড়ির পয়সা সব সময় তো আমিই দিলাম রে চোর। তোর মা টুসটুসি তো এতগুলো গিলতে পারে। নারাণ জানে ভুলু এ সময় হয়ত ধমক দেবে।—কি যা তা বলিস! ওর মাকে জড়িয়ে কেন গালমন্দ দিস। হারাণের তেমন বড় কথা বলার সাহস নেই। হারাণের মাকে সে টুসটুসি বলে সেই কবে থেকে—তখন হারাণ মাত্র চাকের নীচে বালতি ধরতে শিখেছে। হারাণ প্রথম দিকে ক্ষেপে উঠত, আজকাল আর করে না। মাঝে মাঝে নারাণকে খুশী করার জন্য বলে, টুসটুসিটা মরবে। কেবল খাই-খাই ভাব।

—সঙ্গে তুইও মরবি। তোরও কম খাই-খাই ভাব না। এ-ভুলু, তোর খেয়ে আরাম না ধরে আরাম?

ভুলু প্রথমে জবাব দিল না। সে কিছুক্ষণ ধরে ভাবল। তার যেন মনে হচ্ছে মাছটা ধরেই আরাম বেশী। বঁড়শিতে মাছটাকে কায়দা করে তোলা, বর্ষার জল ভেঙে মাছটাকে ঘাটে নিয়ে আসা, মাছ দেখে হেনার আনন্দ, হেনার এ-বাড়ি ও-বাড়ি ছুটে বেড়ানো, একে ওকে ডেকে আনা, দেখো দাদা কত বড় মাছ ধরে এনেছে, দু হাত ওপরে তুলে ওর হৈ চৈ করা, এগুলো আরও আরামের। বেশী সুখের। সেই মাছটা যদি বঁটিতে ফেলে কাটা হয় তবে সে যেন বিষণ্ণ বোধ করবে। খেয়ে তেমন তৃপ্তি হবে না। ওর ইচ্ছা সেই মাছটা ওর ঘাটে বাঁধা থাক চিরদিন। হেনা রোজ আরশোলা ধরে খাওয়াবে। মাছটাকে ওরা দুজন ঘাটে পুষে রাখতে চায়। এমন সব অনেক ইচ্ছে। কিন্তু নারাণকে ঠিক সে প্রকাশ করতে পারল না। সে চুপচাপ ধানক্ষেতে মাকড়সার জালগুলো দেখল।

মেতিকান্দার অনেক বাড়ির অনেক ঘাট সে অতিক্রম করল। সে এখন লগি ধরেছে। বাড়ির ঘাটে ঘাটে নৌকা বাঁধা। বর্ষার জল উঠোনে উঠব-উঠব করছে। স্যাতস্যাতে ভিজে মাটি। কোঁচো-গুলো মাটি খুঁড়ে ঘরের দাওয়ায় গিয়ে উঠেছে। আউশ ধান কেটে আনা হয়েছে ঘাটে ঘাটে। দেওয়ানজী-বাড়ির ঘাটে কুটুম এসেছে দূর

থেকে। নৌকার মাঝিরা রান্না চড়িয়েছে গলুইয়ে। একটি লাল শাড়ি-পরা ছোট্ট মেয়ে মাঝি-মল্লাদের বিরক্ত করছে কেবল। ছই-এর ভেতর লণ্ঠন ঝুলছে। দাওয়ায় বসে দুজন মেয়ে-পুরুষ গল্প করছে। বেতের ঝোপ, গন্ধপাতার ঝোপ, শ্যাওড়াগাছ, আকন্দগাছের ফাঁকে ফাঁকে আরো অনেক বাড়ি। টিন কাঠের ঘর। নকশা-কাটা ঢেউ টিনের ছাদ। বাড়ির উঠোনে মেলার পুতুলের মত শোলার আঁটি দাঁড় করানো। ওদের মাথায় ফড়িং উড়ছে, প্রজাপতি উড়ছে। কয়েতবেলগাছ থেকে পাকা কয়েতবেলের গন্ধ আসছে। আরো সব অনেক গন্ধ। আতপ চাল রান্নার গন্ধ। বেতের ডগা হয়ত সেদ্ধ করতে দেওয়া হয়েছে, তারও গন্ধ। ডান-দিকের একটা ঘাটে বড় বড় দুটো সোমত্ত মেয়ে বঁড়শি ফেলে পুঁটি মাছ ধরছে। ওদের দেখে ওরা হাসল। একটা লোক হিজলগাছের নীচে কোমর জলে দাঁড়িয়ে চাঁই তুলছে। চাঁইয়ের ভিতর চিংড়ি মাছ, ট্যাংরা মাছ। চাঁইটা প্রায় ভর্তি হয়ে গেছে। জলে নিশ্চয়ই এখানে উজান ভাটা আছে। তাই একসঙ্গে এত মাছ। মানুষটার গলায় শঙ্খিনীর হাড় নেই ডেঙ্গুরে জ্যাঠার মত তবু অনেক মাছ পাচ্ছে। মেঘনা ওদের এত মাছ দিচ্ছে। ওর আক্ষেপ হল—মেঘনা যদি সম্মান্দীর আরো কাছে হত, ঠিক মেতিকান্দার মত, দামোদরদীর মত।

মেতিকান্দার বাউড় পার হয়ে ওরা পশ্চিমের দিকে চাইল। এক গম্ভীর এবং ঘননীল এক অন্ধকার নেমে আসছে পশ্চিম থেকে। সেই নীল-নির্জন দেশে গাঙ-ফড়িং-এর দল শেষবারের মত আকাশের নীচে উড়ে ধানক্ষেতের পাতায় পাতায় বিশ্রাম নিল। তখন আজানের ডাক উঠেছে মেতিকান্দার মসজিদে। কাঁসর-ঘণ্টা বাজল মন্দিরে-মন্দিরে। ঘরে ঘরে শাঁখের আওয়াজ। সংসারদীর পুল আর দেখা যাচ্ছে না। নীল-নির্জন অন্ধকারটা ক্রমশঃ কালো হয়ে উঠছে। নৌকা এবার নারাণকে বাইতে হবে। এ পথ ভুলু অন্ধকারে চিনতে পারবে না। বড় অশ্বত্থগাছটার নিচে অন্ধকার খুব ঘন। [illegible]-সাহেবের [illegible]ার খাল অনেক জমি আর অনেক ভিটের পাশ দিয়ে এসে এই [illegible]
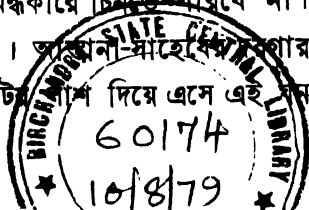
অন্ধকারটুকুতে মিশে গেছে। তারপর সামনে হিজলের বন। অন্ধকার এখানে কাল-কেউটের বিষের মত। হিজল বনের ভিতর দিয়ে খাল গিয়ে নদীতে নেমেছে। জলে হিজল ফলের শব্দ ভয়াবহ। জলের ওপর কাঠ দিয়ে বাড়ি মারছে তেমন শব্দ। শব্দটা ভূতুড়ে। টুপটাপ শব্দ। যেন অনেক ভূত একসঙ্গে খড়ম পায়ে দিয়ে হাঁটছে। সেই বিচিত্র শব্দের ভেতর দিয়ে মেঘনা থেকে উঠে আসবে সব ইটের, কাঠের, আনারস কাঁঠালের নৌকা। ঘন আঁধারে কেউ কাউকে দেখতে পায় না। শুধু লণ্ঠন জ্বলে সারি সারি। হিজলের নিচে অন্য নৌকার শব্দ শুনলে বলে—যার যার বাঁয়ে, চিৎকার করে—যার যার বাঁয়ে মিঞা! ঘন আঁধারে নারাণও চিৎকার করবে—যে যার বাঁয়ে।

নারাণ চিন্তিত হয়ে পড়েছে। আকাশ মেঘে মেঘে ছেয়ে গেল। বৃষ্টি হতে পারে। আকাশে যে আলোটুকু আশা করেছিল সে, তা পর্যন্ত নিভে গেল। এখন অন্ধকার, শুধু অন্ধকার। দামোদরদী পৌঁছুতে অনেক রাত হবে। বেশী রাত হলে দামোদরদীর বাজারে উনুন হাঁড়ি কিনতে পাওয়া যাবে না। ভোরের উজান ধরতে হলে পান্তাভাত খেয়ে বের হতে হবে। সমস্ত দিন মেঘনায় থাকবে। প্রথম দিনে ঢাইন পায় তবে তো কথাই নেই—কিন্তু এ-কাজ তিন দিনে হতে পারে আবার নাও হতে পারে। সবই নসিব। তিন দিনের মত রসদ সংগ্রহ করে এনেছে। অনেক দিন থেকে ওর শখ, জীবনের স্বপ্ন, কলিমদ্দি, ঈদা, নিরঞ্জনের মত ঢাইন শিকার করে গ্রামের লোককে অবাক করে দেবে—ভুলুর খুড়তুতো বোনকে বলবে, দেখ হেনা আমাদের কত সাহস! বড়দের মত মেঘনা থেকে ঢাইন শিকার করে ফিরেছি। এত বড় মাছ দেখছিস কোন দিন? কলিমদ্দি, ঈদা এতবড় মাছ ধরতে পেরেছে? কিন্তু যদি ছোট হয়! খুব ছোট হয়! এইসব কথাগুলো যখন ভাবে তখন নারাণ খুব ছোট হয়ে আসে।

ভাদ্রমাস বলে ধানগাছের আলি ঘন। গাছগুলো কাল রঙ ধরে উঠেছে বলে অন্ধকারটা বর্ষার জলের ওপর চাপ চাপ। ওরা ইচ্ছে করলে নৌকা ক্ষেতের ভিতর দিয়ে বাইতে পারে। ধান এখন থোড়-

মুখো। জমির ভেতর নৌকা চালালে গাছগুলো নষ্ট হবে। যে জমি-গুলোর ওপর বর্ষার আল পড়েছে সেই পথ ধরে নৌকা বাইল। সোজা গিয়ে বটগাছটার অন্ধকারে পড়ল না। ক্ষেত নষ্ট করল না। থোড়মুখো ধান জলের নিচে ডুবিয়ে দিল না।

নারাণ উৎকর্ণ হল। ধূর্ত শেয়ালের মত সে কান খাড়া করে রেখেছে। শব্দটা ওকে উদগ্র করে তুলল।—কিসের যেন শব্দ শুনছি রে! ফিস ফিস করে বলল নারাণ।

ওর' তিন জন সেই ছায়া-ছায়া অন্ধকারে নৌকা থামিয়ে দিল। শব্দটা ধানক্ষেতের ভেতর থেকে উঠছে। কল কল শব্দ। চাঁইয়ের ভিতর মাছ পড়ার শব্দ। ভিটেজমির আলে কেউ হয়ত চাঁই পেতে রেখেছে। নারাণ মাছ চুরি করার জন্য গামছা পরে জলের ওপর লাফিয়ে পড়ল। ডেঙ্গুরে জ্যাঠার চাঁই থেকে সে অনেক মাছ চুরি করেছে, আজ এই রাত্রে তেমন একটা চুরি করতে পারবে ভেবে খুব খুশী হল। সে ধানগাছগুলোকে ঢেউ দিয়ে প্রথমে দুদিকে সরিয়ে দিল তারপর ধারে ধারে সাঁতার দিয়ে ধানক্ষেতের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

ভুলু বিরক্ত হয়ে বলল, কি দরকার মাছ চুরির! যাচ্ছি একটা শুভকাজে।

হারাণ বলল, রাতে বেশ রেঁধেবেড়ে খাওয়া যাবে রে! বড় কৈ মাছ হলে তো কথাই নেই। আহাঃ অমন মাছ!

হারাণ আর ভুলু প্রতীক্ষা করতে থাকল। অন্ধকারেও সে নজর রেখেছে অথবা হুঁশিয়ার হয়ে পাটাতনে অন্ধকার আগলাচ্ছে। কোন নৌকার শব্দ পেলে নারাণকে হুঁশিয়ার করে দেবে। তবু এ-চুরিকে সে মনে মনে কামনা করল না। শুভকাজে যাচ্ছে, তিন দিন তিন রাত থাকবে মেঘনায়। ঝড়, বৃষ্টি, ঘূর্ণি, আরো কত বিপদ। অন্ধকারে কি দরকার এ-ভাবে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার! অথচ এই অপরিচিত অন্ধকারে চুপচাপ বসে থাকতে ভাল লাগছে। হারাণ কথা বলে অন্ধকারটাকে একটু হালকা করতে চাইল। —ঢাইনটা যদি আধমণ হয় আমাকে দশ সের দিস।

—দেব। ভুলু যেন চাইন শিকার করে ঘরে ফিরছে। এবং চাইন মাছটার প্রকৃত মালিক সে যেন নিজে। এমন সময় ধানক্ষেতের ভিতর পরিচিত শব্দে ভুলু বুঝল নারাণ ধানগাছ ফাঁক করে সাঁতার কাটছে। সামনের গাছগুলোকে আবছা আবছা নড়তে দেখছে। ভুলু উঠে দাঁড়াল এবার। ডাকল, নারাণ।

—এই যে আমি। পারিস তো নৌকাটা আর একটু সামনে নিয়ে আয়। গলা জলে দাঁড়িয়ে নারাণ উত্তর করছে।

হারাণ লগিতে ভর দিয়ে নৌকাটা ক্ষেতের ভিতর ঢুকিয়ে দিল। চিৎকার করে বলল, কি কি মাছ পড়ল চাঁইয়ে! কত মাছ হবে? অনেক হবে তো!

সে গলাজল থেকেই উত্তর করল, অনেক মাছ। অন্ধকারে ঠিক আন্দাজ করতে পারছি না। চাঁইটা খুব ভারী হয়ে গেছে, সাঁতার কাটতে পারছি না!

সেই শব্দ এবং ধানগাছগুলোকে লক্ষ্য করে ওরা আরও এগিয়ে গেল। খুঁজে খুঁজে ওরা নারাণকে ধানক্ষেতের ভিতর ডুবু ডুবু অবস্থায় পেল। সে কোন রকমে নাক জাগিয়ে রেখেছে। দু হাতের ওপর চাঁইটা চেপে রেখেছে। নৌকাটা ওর কাছে ভিড়তেই চাঁইটা ওদের হাতে তুলে দিয়ে বলল, দেখ কত মাছ! বলে, ঝাঁকি মেরে নৌকার ওপর উঠল।

হারাণ একটা ম্যাচ কাঠি জ্বেলে চাঁইটা দেখতে গিয়ে ভূতে-পাওয়া রোগীর মত পাটাতনের ওপর গড়িয়ে পড়ল। সে গোঙাচ্ছে। ভয়ে ভুলুর মুখটা শুকিয়ে উঠেছে। নারাণ তখন গামছা দিয়ে গা মুছল। বলল, কিরে কি কি মাছ পড়ল! হারাণটা অমন করছে কেন?

ভুলু খুঁজে বের করল ম্যাচটা। একটা কাঠি জ্বালাল!—দেখ্, কি তুলে এনেছিস?

নারাণ সেই আলোটুকুতেই দেখল এবং বুঝতে পারল একটা সাপ, সাপটা শঙ্খিনী? চাঁইয়ের ভেতর মাছ খেতে ঢুকে নিজেই আটকে গেছে। পেটটা খুবই মোটা। পেটে টিপ দিলে সব মাছগুলি এক্ষুণি

উগলে ফেলে দেবে সাপটা। নারাণ খুব আশ্চর্য হল। এতদিন ধরে সে যা খুঁজছে আজ সে তাই পেয়েছে। এমন একটা ভয়াবহ জীবকে বুকে নিয়ে সে জল কেটেছে ভাবতেই শরীর ওর শিউরে উঠল। কিন্তু হারাণকে জড়াজড়ি করতে দেখে ওর পেটে লাথি মারল। এই টুসটুসির বাচ্চা! সাপটা কি তোকে ছোবল মেরেছে? ছিঃ ছিঃ লজ্জার কথা! আমার সঙ্গে আসিস কেন! অমন মাছ না খেলে কি হয়! চাঁইয়ের ভিতর সাপ রয়েছে, আমরা আছি পাটাতনে। সাধ্য কি সাপটা চাঁই থেকে বের হয়ে আমাদের কামড়ায়; কামড়াবার ক্ষমতা থাকলে এতক্ষণ আমাকে আস্ত রাখত?

হারাণ একটু সাহস পেয়ে বলল, তুই এটা ফেলে দে নারাণ। তোর দু পায়ে পড়ি। দোহাই ভগবানের!

—পাটাতনের নিচে ফেলে রাখব। তোদের কোন ভয় নেই।

ভুলু লগি তুলে আবার চলতে থাকল। বলল, সাপটা ছেড়ে দে নারাণ। কি দরকার ওটাকে আটকে রেখে। ওর জগতে ওকে চলে যেতে দে।

—আবার তোর সেই বড় বড় কথা! তোদের ভয় নেই তো বললুম। আমি যে পাটাতনে থাকব, তার নীচে থাকবে সাপটা। হল তো? চাঁইয়ের ভেতর ওটা ভালমানুষের মত পড়ে থাকবে।

—রেখে কি হবে সাপটাকে?

—ডেঙ্গুরে জ্যাঠার মত মাছের রাজা হব। সাপের ভয় নেই বলেই তো জ্যাঠা আমার মাছের রাজা হল। রাত-বিরাতে ঝোপে-জঙ্গলে জ্যাঠা কত চাঁই পাতল—কোনদিন শুনেছিস একটা সাপ ফোঁস করেছে জ্যাঠাকে। ভেবেছি সাপটাকে মেরে মাটির তলায় পচাব। সাপের রাজা শঙ্খিনী। জ্যাঠার মত শঙ্খিনীর হাড় গলায় পরব। চুল খাটো করে ছেঁটে চোখ দুটোকে টকটকে লাল করব। এক কথায় মাছের রাজা হব। নারাণ চাঁইটাকে পাটাতনের নিচে ঢুকিয়ে দিল একসময়। বলল, যাত্রাটা শুভ রে ভুলু। দেখবি আমরা মেঘনায় চাইন শিকার করবই করব!

—এঁ্যা, করবই করব! হারাণের এত রাগ হচ্ছে যে সে একবার ইচ্ছা করল নারাণের গলাটা টিপে ধরে। অথবা ওকে ধাক্কা মেরে জলে ফেলে নৌকা নিয়ে চলে যায়। সে কিছুই করল না। শুধু ব্যঙ্গ করল ফের, চাইন শিকার করবই করব! চাইন মাছেরা কান্নাকাটি করছে মেঘনায়, আমাদের নারাণবাবু কই! ওনার বঁড়শি বাদে যে আদর নেব না আমরা!

নারাণ কথাগুলো শুনেই বুঝল এই অন্ধকারের মতই হারাণ অসহায়। সেজন্য নারাণ আর রাগ করল না। বরং আরও ভাল করে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল—চাঁইটা খুব শক্ত। চাঁইটার মুখে সে ভাল করে গিঁঠ দিয়েছে। নতুন চাঁই, সুতরাং ভাঙবে না। সুতরাং এমন অসহায়ের মত বসে না থাকলেও চলবে। তারপর নারাণ ফের সাপটার কথা ভাবল। ডেঙ্গুরে জ্যাঠার কথা ভাবল। জ্যাঠার চেহারাটা কেমন শঙ্খিনীর মত। ডোরা কাটা, হল্‌দে রঙ। লিকলিকে—দু মুখো। দু মুখ একসঙ্গে করে কামড়ায় এবং লাফিয়ে কামড়ায়। বিশ থেকে ত্রিশ হাত পর্যন্ত ইচ্ছে করলে শঙ্খিনীরা লাফাতে পারে। শঙ্খিনী সাপেরা অন্য সাপ খায়। ডেঙ্গুরে জ্যাঠা অন্য মানুষের অমঙ্গল করে। বাণ মারে, তোষক করে। শঙ্খিনী সাপের হাড় গলায় পরে অন্য সাপের সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলে। আর ঝোপ-জঙ্গলের যত মাছ জ্যাঠার চাঁইয়ে ভিড় করে। নারাণের চাঁইয়ে মাছ পড়ে দুটো-একটা। সেজন্য ভোর রাতে সে জ্যাঠার মাছ চুরি করে। চুরিকরা মাছ বাড়ি বাড়ি বিলিয়ে দিয়ে বলে, আমার চাঁইয়ের মাছ। জল টান দিয়েছে বলে মাছ পড়ছে বেশী। অন্য মানুষেরা তখন বাহবা দেয়। সে খুশী হয়। বাহবা দেয় হারাণের মা টুসটুসি সকলের চেয়ে বেশী।—বাবা নারাণ, বড় বড় মাগুর মাছ পেলে আমায় দুটো দিবি? গাঁয়ে তোর মত মাছ আর কে ধরতে পারে? তুই তো মাছের রাজা রে!

সাপের রাজা শঙ্খিনী, মাছের রাজা নারাণ। টুসটুসির এই কথাটাই শুধু ওর ভাল লাগে। মাছের রাজা নারাণ এ কথা গাঁয়ের আর কেউ বলে না। বরং এ-কথা বলবে, নারাণ ডাঙায় পর্যন্ত মাছ

ধরতে পারে। কিন্তু ওরা টুসটুসির মত মাছের রাজা বলে না। সে-জন্যেই ওর যত দুঃখ। তবু সে-নৌকা নিয়ে ঘোষেদের ঘাটে, দত্তদের পুকুরে, ভুলুদের গাবগাছটার নীচে ভিড়ায়। বলে, কটা মাছ আছে। হেনা মাছগুলো আজ তোকে দিলাম। দত্তর ভাইঝি খুশীকে বলে, নে পিসি, মাছ ধর। ঘোষেদের নতুন বৌ শংকরীকে বলবে, কি বৌদি, কালকের ডিমওয়ালা পুঁটি মাছগুলো খেতে কেমন লাগল? হেনা, খুশী, শংকরীর ভারি ভারি চোখ। সে চোখগুলোই ওকে বেশী মাছ ধরতে বলে। ওর মাছ ধরার আনন্দ মেয়ে তিনটির চোখে। সেজন্যই সে মাছ বিলিয়ে দেবার সময় বলে, মাছ খেয়ে সুখ নেই, তোদের দিয়ে সুখ, বিলিয়ে সুখ। তবু বিলিয়ে-সুখ মানুষটার শুধু দুঃখ, ওরা কোনদিন ওকে মাছের রাজা বলল না। মাছের রাজা বলল শুধু টুসটুসি। পেটফুলো মেয়েমানুষটাকে সে পছন্দ করে না। টুসটুসির পেটমোটা। মাগুর মাছ খেয়ে খেয়ে পেট মোটা হয়ে গেছে। নারাণ জানে মাছের রাজা বলে টুসটুসি ওকে কটাক্ষ করে শুধু। হারামজাদা হারাণি ওর মাছ চুরির গল্প সব ওর মা-র কাছে করেছে। এবার যদি মেঘনার বড় চাইন সে শিকার করতে পারে তা হলে হেনা, শংকরী খুশী হয়ে নিশ্চয় বলবে, এ যে মাছের রাজার কাণ্ড!

মাছের রাজা যদি সে হতে পারত! ডেঙ্গুরে জ্যাঠার কাছে থেকে মাছের রাজাদের সম্বন্ধে কত বিচিত্র রকমের গল্প শুনেছে। মাছের রাজা, মাছের রাজাকে ধরে মাছের রাজা হয়। ওরা সাপকে ভয় পায় না, ভূত প্রেত ওদের মাসতুতো পিসতুতো ভাই। কিন্তু নারাণ এখনও সকলকে কম বেশী ভয় পায়। কম বেশী নজরানা দেয়। সাপ-খোপের ভয়ের জন্য অনেকদিন থেকে শঙ্খিনী খুঁজছিল—আজ একটা পেয়েছে। ভূতের ভয়ের জন্য ভুলুকে দলে রেখেছে। ভুলু ভালমানুষ, তার ওপর বামুন ঠাকুর। গলায় পৈতা আছে। নারাণের ঠাকুমা বলেছেন নারাণকে, গলায় পৈতা থাকলে ভূত, ব্রহ্মদৈত্য, নিশির ডাক কেউ কাছে ভিড়তে পারে না। ভূতের যন্ত্রণায় রাতে মাছ ধরা কঠিন —ডেঙ্গুরে জ্যাঠা এ-কথা বলেছে। আস্তানা-সাহেবের দরগার শিমূল

গাছটায় যে ভূত থাকে কতবার কলিমদ্দিকে তাড়িয়ে নিয়ে সনকান্দার পুকুর পাড়ে ফেলেছে। কলিমদ্দির বড় ভাই অলিমদ্দিকে পাওয়া গেছিল তিনদিন পরে। পল নিয়ে রাতে জোয়ারের জলে সরপুঁটি ধরতে বের হয়েছিল! ঘরে আর ফিরে আসে নি। তিনদিন পর ওর লাশ পাওয়া গেছিল নেকিখাঁর বিলে। আরো সব কত গল্প। সব গল্পগুলো সে ঠিক মনে করতে পারছে না। এতদিন ধরে ঘুরেও একটা ভূতের মন্ত্র সে জ্যাঠার কাছ থেকে নিতে পারল না। ওর খুব আফসোস হচ্ছে। এতদিন ধরে জ্যাঠা শুধু ওকে ভূতের গল্প বলেই ভুলিয়ে রাখল।

ওরা সংসারদীর বটগাছের নিচে এসে গেল! অন্ধকারটা আল-কেউটের বিষের মত। ওদের শরীর শির শির করে কাঁপল। ভুলু হালে আছে? নারাণ হারাণ দাঁড় টানতে থাকল। ওরা শক্তি পাচ্ছে না হাতে। ওরা আড়ষ্ট। বৈঠাগুলো খুব ভারি হয়ে গেছে। ঝোপের ভিতর একটা ডাহুক ডাকল। সামনে হিজলের বন। সারি সারি হিজলগাছ। হিজল গাছগুলো ব্রহ্মদত্যির মত অন্ধকারকে পাহারা দিচ্ছে। জলের ওপর সেই বিচিত্র শব্দ। টুপটাপ একটি অদ্ভুত জলতরঙ্গের আওয়াজ। অথবা মাছ ধরার সময় জলের উপর কাঠের বাড়ি অথবা অনেকগুলো ভূত খড়ম পায়ে দিয়ে অন্ধকারে ছুটোছুটি করছে যেন। সব শব্দগুলো ওরা দাঁড় বাইবার সময় শুনল। ওরা বুঝতে পারছে ওগুলো ভূত নয় কিংবা খড়মের শব্দও নয়। জলের ওপর হিজলের ফল ঝরে পড়ছে। জলের ওপর হিজল ফলের শব্দ। এই পরিচিত খবরটুকুর ভিতর অন্য একটি পরিচিত প্রেতাত্মা যেন উঁকি মারছে। ওরা তিনজনই সেই ফাঁসি-যাওয়া কুষ্ঠরোগীর মুখটা মনে করে হরে রাম, হরে রাম বলে উঠল।

ভুলু গায়ত্রী জপ করছে এখন। বাবা বলেছেন, ভয় ধরলে গায়ত্রী জপ করবে। কোন প্রেতাত্মা তোমার আশেপাশে ঘুরতে থাকলে গায়ত্রী উচ্চারণ করবে। কেউ তোমার অনিষ্ট করতে পারবে না। ভুলু গায়ত্রী জপ করে অদ্ভুত সাহস পেল। ভয়াবহ বটগাছটা বাড়ির

শেফালি গাছের মত। জলের ত্বপাশের ঝোপগুলোকে সে ঠাকুর-ঘরের পিছনে পাতাবাহারের ঝোপ ভাবল। গায়ের জ্বর ছাড়ার মত সে নিজেকে হালকা অনুভব করল। হারাণ নারাণকে উদ্দেশ করে বলল, আমি গায়ত্রী জপ করছি হারাণ, কোন ভয় নেই। তোরা জোরে বৈঠায় চারি মার।

নারাণ নড়েচড়ে বসল। হারাণ হাতগুলোতে ক্রমশঃ শক্তি পাচ্ছে। ওরা জোরে বৈঠায় চারি মারল। হারাণের ইচ্ছা ভুলু গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করুক। নারাণ কিন্তু জানে যারা শূদ্র তাদের সে মন্ত্র শোনার অধিকার নেই। কোন শূদ্রের নিকট সে-মন্ত্র উচ্চারিত হলে মন্ত্রের গুণ নিম্নমুখী হবে, এও শুনেছে। সে চাইল না মন্ত্র উচ্চারিত হোক। বরং মন্ত্র উচ্চারিত হলেই ওর ভয়টা বাড়বে।

প্রথম ওরা ত্বটো লণ্ঠন দেখল ত্বটো চোখের মত। অন্ধকারের ভিতর লণ্ঠন ত্বটো একটা ব্রহ্মদত্যির মুখ সৃষ্টি করেছে। ওরা তিন-জনই জানত খাল ধরে নদী থেকে নৌকা উঠে আসছে। নৌকায় লণ্ঠন জ্বলছে। নৌকাগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে উঠে আসছে বলে লণ্ঠন ত্বটো ত্বলছে। খুব কাছে এল নৌকা ত্বটো। নারাণ চিৎকার করে বলল, যার যার বাঁয়ে মিঞা, যে যার বাঁয়ে।

—যার যার বাঁয়ে মিঞা, যে যার বাঁয়ে। নৌকার মাঝিরা জবাব দিল। নৌকা ত্বটো উল্টো মুখে উঠে গেল। ভুর ভুর গন্ধে ওরা বুঝেছে ত্বটো কাঁঠালের নৌকা গেল। বৈঠা জলের ওপর তুলে নারাণ বলল, কাঁঠাল কিনে নিলে হত রে। দামোদরদী গিয়ে যদি কিছু না পাই, দোকানের ঝাঁপ যদি বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে!

হারাণ কোন কথারই জবাব দিল না। ভয়ে ওর ক্ষিদে চলে গেছে। এমন ভয় পাবে জানলে সে ঢাইন শিকারে আসত না। বছরটাই ওর খারাপ। শনির দৃষ্টি পড়েছে। তা ছাড়া টুসটুসি—টুসটুসির কথাতেই এসেছে। সমস্ত রাগ মায়ের ওপর গিয়ে পড়ল। এখন মনে হচ্ছে ওর মা লোভী, পেটুক, স্বার্থপর। মা তাকে চুরি করতে শেখাচ্ছে। কোন্ জমিতে ধনেপাতা, কোন্ গাছে কামরাঙা পেকেছে

সব এসে হারাণকে তার মা বলত। হারাণ যেন যায়। হারাণ যেন আড়ালে-আবডালে নিয়ে আসে। অম্বল হবে। ধনেপাতা পুঁটিমাছের ঝোলে দেওয়া হবে! এইসব করেই চুরিতে সে হাত পাকাচ্ছে। পরে বড় কিছু একটা করবে। নিশ্চয়ই করবে। লোভ মানুষকে মানুষ রাখে না।

আকাশে সেই কখন থেকে মেঘ জমেছে। রাত ঘন হয়ে উঠছে। বৃষ্টি এলে ওদের ভিজতে হবে। নারাণ আরো জোরে বৈঠায় চারি দিল এবার। ভুলু ধান-পাতার গায়ে জোনাকি জ্বলতে দেখল। একটা, দুটো—একসঙ্গে অনেকগুলো! আকাশের তারার মত অগুনতি। রাতের অন্ধকারটাকে জোনাকিরা আরো ভূতুড়ে করে রেখেছে, আরো ভয়াবহ করে তুলেছে। পাশে কোথাও ডাঙা আছে অথবা জলের ওপর নাক জাগিয়ে ডাকছে শেয়ালেরা। ভুর ভুরে পচা ... পাশের দহটাতে—গরু, ছাগল, ভেড়া কিছু-একটা হবে! পচাগন্ধে ওদের নাড়ী উল্টে আসতে চাইল। ব্যাঙ ডাকছে কলমী-লতার ঝোপে। ওরা নৌকা বাইতে বাইতে গান ধরল কারণ ওরা জেনেছে নদীতে পড়তে আর দেরি নেই।

মেঘনা খুব কাছাকাছি এসে গেল। ওরা ঢেউয়ের গর্জন শুনতে পাচ্ছে। গভীর গাঙে চাইন মাছগুলো উজানে উঠে আসছে হয়ত। ওদের রূপালী রঙ গভীর জলে চিড়িক মারছে হয়ত। এমন সময় ওরা কয়েকটা লণ্ঠন পাশাপাশি জ্বলতে দেখেই বুঝল দামোদরদীর হাটে ওরা পৌঁছে গেছে।

হাটে পৌঁছে মাঠের পাশেই লগি পুঁতল নারাণ।

নৌকার দড়ি শক্ত করে বাঁধল লগিতে। পাশে তিন চারটা আনারসের নৌকা। ভাওয়াল থেকে অনেক কাঁঠালের নৌকা এসেছে। ওরা মাঠের অন্য পাশে নোঙর করেছে। কাল হাটবার। হাট ধরার জন্য সব নৌকাগুলো রাতে এসে এখানে লগি পুঁতেছে। ওরা কাল এলে নৌকা কিনারায় ভিড়াতে পারত না। হাটের পাশে ছোট, বড়, মাঝারি, কোষা-ডিঙ্গি-বাইচ-পানসী কত রকমারী নাও কাল সওদা

করতে আসবে। লোক আসবে দূর দেশ থেকে। পূর্ব দেশ থেকে জলকচু আসবে, কয়লা আসবে। পশ্চিম থেকে যাত্রী আসবে বাজার করতে। লোকে গমগম করবে কাল। নৌকায় নৌকায় ঠোকাঠুকি হবে, গান হবে, বাজনা হবে। নৌকায় নৌকায় বিক্রি চলবে তখন।

লগিতে দড়ি বেঁধে নারাণ সব এক এক করে দেখল। ভুলু উঠে গিয়ে ওর পাশে দাঁড়াল। দামোদরদী সে এই প্রথম এসেছে। আলিপুরার হাট সে চেনে। সেখানে সে যাওয়া-আসা করে! কিন্তু আলিপুরার হাটে এত বড় আনারসের নৌকা সে দেখে নি। সে বড় বড় নৌকাগুলো দেখে আশ্চর্য হল। গলুইয়ে বসে মাঝিরা গল্প করছে। তামাক সাজছে কেউ। তুজন মাঝি নামাজ পড়ছে ছইয়ের ওপর। কোন কোন গলুইয়ে রান্না চড়িয়েছে মাঝিরা। তেল রসুনের একটা ঝাঁঝাল গন্ধ উঠছে। নৌকায় নৌকায় আনারসের গন্ধ, কাঁঠালের নৌকায় অনেক কাঁঠাল—অদ্ভুত রকমের পাঁচমিশালী গন্ধে ভুলুর ক্ষিদেটা ক্রমশঃ চড়তে থাকল।

লাফ দিয়ে পাশের নৌকায় উঠল নারাণ.—তোরা বোস, আমি আসছি। যে মাঝিরা বসে গল্প করছিল ওদের ভিতর ঢুকে বলল, এই মিঞা, আনারস বিক্রি করবে? এক গণ্ডা আনারস কত নেবে?

কচি বয়সের মানুষটাকে দেখে মাঝিমাল্লাদের ঔৎসুক্যের অন্ত থাকল না। ওরা বলল, কাল বিক্রি হবে আনারস। বিশমিল্লার নাম করে কাল ভোর থেকে বিক্রি আরম্ভ করব।

—দরকার আমার এখন, বিক্রি করবে তুমি কাল। বেশ কথা বললে যাহোক। ক্ষিদেয় আমাদের পেট জ্বলে যাচ্ছে।

মাঝিমাল্লারা সব চুপ করে থাকল।

ভুলু কোষা-নৌকা থেকে বলল, এক গণ্ডা আমাদের দিয়ে দাও। দামটা কালই নেবে। বিক্রিটা তাহলে কাল থেকেই হল ধরতে পারবে।

পাটাতনের ওপর বসে বসে বিরক্ত হচ্ছে হারাণ। কি দরকার এই খোশামোদে। এতক্ষণে তো দেখে আসতে পারত নারাণ হাঁড়ির

দোকানে, চালের দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গেছে কিনা। উঠি-উঠি করে করে এবার সে নিজেই উঠে পড়ল। ডাকল, এই নারাণ, চল হাটটা একবার ঘুরে আসি। চাল হাঁড়ি দেখি পাই কিনা।

ওরা চলে গেলে ভুলু পাটাতনে একা বসে থাকল। একা বসে থাকতে ভাল লাগল। এ-যেন সে অন্য দুনিয়াতে চলে এসেছে। এ যেন অন্য এক পৃথিবী। চারিদিকে জল জল। নৌকা নৌকা। মাঝিমাল্লা! ভাটিয়ালী গান। নায়ে নায়ে ঠোকাঠুকির শব্দ। মঠের সিঁড়িতে নদীর ঢেউ আছড়ে পড়ছে। অন্ধকার নদীতে কুলকুল শব্দ। অন্ধকারে ঢেউগুলো নদীতে উথাল পাতাল। মুহূর্তের জন্য জীবনটাকে নদীর মত মনে হচ্ছে। পাশের নৌকায় মাঝি-মাল্লাদের গল্প—শুয়ে শুয়ে ওরা মধুমালার গল্প করছে। সে এখন চুপচাপ বসে মধুমালার গল্প শুনছে। মাঝিরা গান ধরেছে—কে যায় রে মধুমালার দেশে···ভুলুর মনে হল এই পথ ধরেই মধুমালার দেশে যাওয়া যায়। এই নদী দিয়ে আর এই নাও নিয়ে। মাঝিমাল্লারা পাশের নৌকায় তখনও গান করছে, কে যায় রে মধুমালার দেশে, সোনার ডিঙি রূপোর বৈঠা বেয়ে।···মনে হল তার, ওর কোষা-নৌকাটা সোনার ডিঙি, হাতের বৈঠাটা রূপোর বৈঠা। মেঘনার বুকে কোন সোনালী রাতের নৌকায় যদি সে বাদাম তুলে দেয় তবে হয়ত ভোরের কোন সোনালী আলোয় দেখবে মধুমালার ঘাটে তার ডিঙি ভিড়েছে। দেখবে ছোট ফুটফুটে একটি মেয়ে সাঁতার কাটছে ঘাটে। সে হয়ত তাকেই বলবে, মধুমালার ঘর আর কতদূর? মেয়েটি তখন সঙ্কুচিত হবে, মৃদু হেসে বলবে, এস। তারপর কিছুদূর গিয়ে একটুক্ষণের জন্য থামবে মেয়েটি। মাটির বুকে চোখ রেখে বলবে, তোমার কোন্ দেশেতে ঘর? হঠাৎ একটা প্রশ্ন শুনে ভুলু বুঝল সে পাটাতনেই আছে। আনারসের নৌকা থেকে একজন মাঝি উঁকি দিয়ে বলল, ও বাবু, রাতে তোমরা এখানে কি করতি এলা?

ভুলু মুখ তুলে বলল, মাছ ধরতে। চাইন মাছ ধরব মেঘনায়।

—গহীন জলের মাছ তোমরা তুলতে পারবা?

—খুব পারব। ঈদার কাছ থেকে নারাণ সব কসরত শিখে এসেছে।

—দেশ তোমার কোথায়? কোন গাঁ থেকে এলা?

—গাঁ আমাদের বেশীদূর নয় গো। সাম্মান্দী আমাদের বাড়ি। সাম্মান্দীর ভূইঞা-বাড়ির নাম শুনেছ? সে-বাড়ির ছেলে আমি, বাবার কাকীমার কাছে থাকি।

মাঝির যেন খুব দরদ হল ভুলুর মুখ দেখে।—আনারস খাবা? দাম দিতে হবে না। বলে, দুটো আনারস ভুলুর হাতে বাড়িয়ে দিল। —ওরা আসলে সবাই মিলে তোমরা খাবা'খন।

ভুলু ঘাড় নাড়ল। সে খাবে এবং সবাই মিলে খাবে। সে বুড়ো মানুষের মত প্রশ্ন করল—মাঝি, তোমার নাম?

—কেরামতালী শেখ। বাজীর বড় শখের নাম।

—মাঝি কতদিন থাকবা এখানে?

—পরশুতক। তারপর আবার নাও ভাসায়ে মেঘনার পানী মেরে আরো উত্তরে চলে যাব। যাবা আমাদের সঙ্গে?

—সে কি হয় মিঞা! তবু ভুলুর মনে হল এই মাঝি-মাল্লাদের জীবন, এই নাও বেয়ে চলা ক্রমাগত, দক্ষিণ থেকে উত্তরে, আরো উত্তরে হারিয়ে-যাওয়া কোন এক মধুমালার কান্না শোনার জন্যই বুঝি। ওরা বুঝি এ-হাট থেকে সে-হাটে মধুমালার দেশকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে।

হারাণ নারাণ ফিরে এসেছে। রান্না করবার জন্য যা কিছু প্রয়োজন সব নিয়ে এসেছে তারা। রান্না হল এক সময়। ভুলুই রান্না করেছে। নায়ের ওপর দোষ নেই। কাঠের ওপর, নদীর ওপর বামুন কায়েত ফারাক নেই। ভুলু তবু একটু দূরে বসে ওদের দুজনকে আড়াল দিয়ে খেল। বছর দুই হল ওর পৈতা হয়েছে। কোন সহৃদয় যজমান ওর ব্রহ্মচারি ভাঙায় নি। তাই খাবার সময় ভুলু এখনও মৌন থাকে। নারাণ এই সব নিয়ম মানে। ভুলু যখন খাচ্ছিল তখন সে চোখ তোলে নি। হারাণ চুপি চুপি দেখছে, দেখে দেখে পুণ্য সঞ্চয় করছে।

অন্যান্য নৌকায় মাঝিরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে। ওরা তিনজন শুয়ে পড়ল কাঠের পাটাতনের ওপর। মাথায় লাগছে শক্ত কাঠগুলো। ঘুম সেজন্য আসছে না। তবু এক সময় ভুলুকে ধরে ওরা দুজন ঘুমিয়ে পড়ল। ভুলুর ঘুম এলো না। আকাশের নীচে অজস্র তারার অন্ধকারে সে এই প্রথম শুয়েছে। শুয়ে শুয়ে অনেক কিছু ভাবতে ভাল লাগল। ভাবল, হেনার যদি অসুখ সেরে যেত—সে যদি আবার চঞ্চল হত, উচ্ছল হত। সে শুয়ে শুয়ে অজস্র রকমের শব্দ শুনছে। সে ভাবল এই বিচিত্র পৃথিবীতে কত জীব, কতরকমের ভাল মন্দের সংসার—সুখ, দুঃখ। এক একটি শব্দ যেন এক একটি সুখ দুঃখের প্রকাশ।

সংসারদীর বটগাছটার ওপর যে মেঘ আকাশে জড়ো হয়েছিল এখানে এখন সে মেঘ নেই। এখানে এখন আকাশ পরিষ্কার। মোতিকান্দার বাউড়ে নারাণ আকাশে যে আলোর আশা করেছিল সে আলোয় আকাশ এখন ঘষা পেতলের মত রঙ ধরেছে। ভুলুর একবার ইচ্ছা হল নারাণকে ডেকে এ-মনোরম আকাশটাকে দেখায়। আকাশটায় যারা থাকে তাদের ভাল মন্দ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। বাবা বলেছেন সেখানে স্বর্গরাজ্য আছে। সেখানে দেবতারা থাকেন। দেবতাদের আবার ভাল-মন্দ কি! কিন্তু মাস্টারমশাই বলেছেন আকাশের তারাগুলো সব গ্রহ-নক্ষত্র। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র সব মিলে সৌর-জগৎ। কিন্তু এই নীল-নির্জন পৃথিবীতে শুয়ে বাবার কথাগুলোই ভাবতে বেশী ভাল লাগল। আকাশে স্বর্গ আছে, দেবতারা আছেন। সূর্য দেবতা, চন্দ্র দেবতা তাঁদের নিজেদের রথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে যান। রোগ-শোক-জরা থেকে মানুষকে রক্ষা করেছেন। অপরিচিত এই স্থানটুকু, কাঁঠালের নৌকা, কেরামতালী শেখের মধুমালা, আনারসের গন্ধ তাকে যতটা রোমাঞ্চিত করেছে এই ভাবনাগুলোও তাকে তেমন রোমাঞ্চিত করেছে। বাপ-পিতামহের চিন্তাগুলোকে বদ্ধ জলের মত মনে হচ্ছে না, অসীম সমুদ্রের মত মনে হল। সেই সংস্কার এবং বিশ্বাসের সে অনুগামী

হতে চায়। এই সুখ-দুঃখের অনিশ্চিত পৃথিবীতে তারা যেন তার এতটুকু অবলম্বন। উড়ো-জাহাজ সে দেখেছে, আশ্চর্য হয়েছে সকলের চেয়ে বেশী। কিন্তু সেখানে যেন এতটুকু আশার খবর নেই। তারা স্বর্গরাজ্যের দরজাকে ভেঙে দিচ্ছে।

সহসা হারাণ উঠে বসল চুপি চুপি। সে পাশের আনারসের নৌকায় উঠে গেল। ভুলু হারাণকে অন্য নৌকায় এ-ভাবে উঠে যেতে দেখে আশ্চর্য হল। ভাবল একবার ডাকে, হারাণ যাচ্ছিস কোথায়। কিন্তু ডাকতে গিয়ে নারাণের যদি ঘুম ভেঙে যায়। সে উঠল না। ডাকল না।

কিন্তু হারাণ আবার ফিরে এসেছে চুপি চুপি। হাতে ওর চারটা আনারস। পাশের নৌকা থেকে সে চুরি করে এনেছে। এবারেও ইচ্ছা হল ডাকে, হারাণ তুই করেছিস কি! ছিঃ ছিঃ! শেষ পর্যন্ত তুই আনারস চুরি করলি! না, ডাকবে না। কিছু বলবে না। এই কথাগুলোও আবার ভাবল ভুলু।

পাটাতনের নিচে খুব সন্তর্পণে আনারস চারটা রেখে দিল হারাণ। তারপর ভুলুর পাশে এসে শুয়ে পড়ল এবং ঘুমিয়ে পড়ল।

রাত যখন গভীর, জোনাকিরা যখন নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে একে একে ঝোপের অন্ধকারে আত্মগোপন করছে, চরের বুকে শিয়ালেরা যখন ডাকছে, মাঝি-মাল্লারা যখন গরমে এ-পাশ থেকে ও-পাশ করতে লাগল তখন ভুলু সন্তর্পণে পাটাতনের উপর উঠে বসল। গলুই-এর পাটাতনের নিচে শঙ্খিনী সাপটা ফোঁস ফোঁস করছে। ছোবল মারছে চাঁইয়ের বুকে। ভেঙে দুমড়ে দিতে চাইছে চাঁইটাকে। চাঁইটাকে কোনরকমে তুলে জলে ফেলে দিতে পারলে হত। কিন্তু অন্ধকারের ভিতর কোথায় হাত দেবে! ভয়ে সে গলুই-এর দিকে গেল না। নৌকার অন্যপ্রান্তে পাটাতনের নিচে থেকে চারটা আনারস খুব সতর্কভাবে তুলল। তারপর পাশের নৌকায় সে আনারস চারটা রেখে এসে ওদের ভিতর শুয়ে নাক ডাকাতে থাকল।

॥ দুই ॥

পৃথিবীর ধূসর রঙটা ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কাকগুলো ডাকছে মঠের মাথায়। মাঝি-মাল্লারা ভাবল, ভোর হচ্ছে। উত্তাল মেঘনার অন্য তীর তখন ধূসর। গোপালদীর গয়না-নৌকার যাত্রিরা ঢুলু ঢুলু চোখে সেই ধূসর তীরের দিকে চেয়ে বলছে, মাঝি, নাও একবার তীরে ভিড়াও।

ঝাঁকে ঝাঁকে পানকৌড়ি দামোদরদীর বিলে নেমে আসছে। নৌকায় মাঝি-মাল্লারা এক এক করে উঠতে শুরু করল। ভিনদেশ থেকে রকমারী নাও এসে হাটের চারিদিকে লাগছে।

হারাণ নারাণ উঠল। ভুলু উঠল। ওরা নৌকা নিয়ে প্রথম একটা ঝোপের ধারে চলে গেল। তারপর মেঘনার জলে নৌকা ছেড়ে দিয়ে ওরা পান্তাভাত খেল। জল খেল। এবার ওরা উজানে নৌকা বাইবে! ভুলু হালে এল। ওরা আড়কাঠে বৈঠা ফেলে ভোরের বিষণ্ণ আমেজের ভিতর চলল বারদীর দিকে।

নারাণ বলল, দেখছিস?

হারাণ এদিক ওদিক চেয়ে বিস্মিত হল।—এত নৌকা! ওরা যাচ্ছে কোথায়!

ভুলু দক্ষিণ দিকে চেয়ে দেখল নদীর জল ধরে প্রায় হাজার হবে ছোট বড় কোষা-ডিঙি উঠে আসছে। নদীর কালো জল আরো কালো করে তুলেছে। ওরা বাদাম চড়াতে পারে নি। হাওয়া দিচ্ছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। ওদের সঙ্গে ঐ হাজার নৌকা উজানে যাচ্ছে।

ভুলু বললে, ওরা কোথায় যাবে?

—আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে।

—এত নৌকা মেঘনায় চাইন শিকার করতে বের হল!

ভুলু আবার প্রশ্ন করল, ওরা রাতে ছিল কোথায়?

—ঈশ্বর জানে।

নারাণের ঈশ্বরে ভক্তি দেখে ভুলু হাসল। তারপর মনে হল হাজার নৌকা যেন রাজকন্যা মধুমালাকে খুঁজতে বের হয়েছে। যুদ্ধে জয়লাভ করে দেশে ফেরার মতনও ঘটনাটা। অথবা বিজয় সিংহের মত লঙ্কা জয় করতে যাচ্ছে। এতগুলো নৌকার ভিতর ওরা ছোট তিনটে মানুষ। ভাবতে ভাল লাগছে খুব, জোয়ান জোয়ান মানুষগুলোকে ঢাইন শিকার করে আশ্চর্য করে দেবে।

পূব আকাশ রক্তলাল। সূর্য উঠেছে। অন্য তীর ধূসর। নদীর জলে সিঁদুর গোলা রঙ। ডিঙিগুলোর ছায়া ভাসছে জলে। বাদামের ছায়া পড়েছে জলের ওপর। নৌকার আরোহীরা বসে বসে স্বপ্ন দেখছে, গাঙের গহীন জলে সব ঢাইন মাছের ঝাঁক। ঢাইন মাছগুলো শুঁড় নাড়ছে। গাঙের ওপর ছায়া ফেলে পাখিরা উড়ছে তখন। হয়ত ওরা আড়িয়লের বিলে কিংবা দক্ষিণের বিলে যাবে, ঠুকরে ঠুকরে ডারকিনা মাছ কিংবা পচা শাপলার পাতা খাবে।

নদীর জল ছোট ছোট রেখাতে উঠছে নামছে! গোলামকুচির মত ভাঙাগড়া হচ্ছে। আকাশ লাল, পৃথিবী লাল। লাল সূর্য অনেকগুলো কালো পাখির অন্ধকারে উঁকি দিচ্ছে। শঙ্খিনী ফুঁসছে মাচানের নিচে। হাজার নায়ের দাঁড় পড়ছে মেঘনায়। জলের রেখা উত্তাল হচ্ছে, বড় বড় ঢেউ তুলছে তারা। হাজার ডিঙির কিংবা লম্বা ছিপের বাইচ খেলা হচ্ছে যেন।

নারাণ বলল, নদীটা সাপিনী। শঙ্খিনীর মত সে বহু মানুষের সর্বনাশ করেছে। এখান থেকে সোজা পূবে চলে যাও—কোথাও তোমার তীর মিলবে না। সব ভেঙেচুরে নদী সে তার স্রোতের সঙ্গে উত্তাল হয়েছে! এসব কথা নিরঞ্জন নারাণকে বলত। গতবার নিরঞ্জনের নৌকায় সে মেঘনার ওপর তিন দিন ছিল।

ভুলু হালের ওপর ঝুঁকল।—তোর কি ইচ্ছা যায় না নারাণ পূব থেকে পূবে, অথবা নদীর স্রোতের সঙ্গে নেমে গিয়ে কোন মোহনায় হারিয়ে যেতে।

হারাণ বিরক্তভাবে বলল, হারিয়ে গিয়ে হবেটা কি!

—তুই বুঝবি না হারাণ। আমার মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় দূর থেকে আরো দূরে যাই। যাবি একবার? আমি, তুই, নারাণ ভাটার মুখে নৌকা ছেড়ে দিয়ে বসে থাকব। নৌকাটা যেখানে গিয়ে ভিড়বে সেখানে গিয়ে নামব। আমার খুব দেশ দেখতে ইচ্ছা হয়। ঢাকা শহর দেখে আসব, সেখানে মোটরগাড়ি আছে, রেলগাড়ি আছে। রেলগাড়িতে মোটরগাড়িতে চড়ব। হ'লে কি মজা হ'ত!

সে চুপ করে বসে থাকল কিছুক্ষণ। উত্তর থেকে উত্তরে, দক্ষিণ থেকে দক্ষিণে হারিয়ে যাওয়ার ভাবনাটাকে অনুভব করতে চাইল। অন্য পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধকে অনুভব করতে চাইল। শান্ত ঢাকা গেছে। কাকীমা প্রতি বছর ঢাকা যান। কাকীমা তাঁর বড় ছেলে শান্তকে নিয়ে ঢাকা শহরটা ঘুরে বেড়ান। সদরঘাটে কামান দেখেছে শান্ত। রেলগাড়ি দেখেছে সে। মোটরগাড়িতে চড়েছে। শান্তর মামার মোটর আছে। বড় হয়ে ভুলুও একটা মোটর কিনবে। ঢাকা থেকে এসে বাড়ির বারান্দায় বসে শান্ত রেলগাড়ির মোটরগাড়ির গল্প করত ভুলুকে। ছবিতে রেলের ইঞ্জিন, কোথায় যাত্রীরা বসে—সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখাত। ভুলুর মনে হত তখন, শান্ত তার চেয়ে অনেক বড়, অনেক পণ্ডিত। শান্তর পাশে হেঁটে হেঁটে গর্ব অনুভব করত সে।

দাঁড় টানতে টানতে নারাণ এক সময় বলছিল, অত ফোঁস ফোঁস করিস না সাপের পো। আর দুদিন ত তোর পরাণ আছে। ফোঁস ফোঁস করে আমাদের ভয় দেখাবি ভাবছিস? সে হবে না। ডেঙ্গুরে জ্যাঠার সাগরেদ আমি। গলায় তোর হাড় পরে যেদিন মাছের রাজা হব সেদিন বুঝবি আমি কেমন মানুষ।

—বুঝলি....। ভুলুকে ডেকে বলল নারাণ, আসমান্দির চর ধরে বিশ মাইলতক পূবে চলে যাবি। কোন গ্রাম পাবি না, সব ধূ-ধূ করছে। অথৈ জল। মাঝে মাঝে দু-একটা চর চোখে পড়বে। সেখানে অশ্বত্থগাছের ঘন জঙ্গল। খুঁজলে এখনও অনেক ডাকাতের কংকাল খুঁজে পাবি সেখানে। উত্তাল মেঘনা পাপীকে কোন কালে

অভয় দেয় নি। হারাণ, তুই দিন দিন চোর হয়ে উঠছিস। নৌকা ডুবলে সব দোষ তোর।

—সব দোষ আমার বললেই হল! আমি কি চুরি করেছি, চোর চোর বলছিস আমাকে?

—চুরি করেছিস। চুরি না করলে আমি বলি। পাটাতনের নিচে চারটা আনারস কে রেখেছিল?

হি হি করে হাসল হারাণ। কিছু আর বলতে পারল না। ওরা তিনজন দাঁড় ফেলছে। পিছনের নৌকাগুলো ওদের প্রায় ধরে ফেলল।

হারাণ বললে, ভাবলুম সমস্ত দিন মেঘনায় থাকব, ক্ষিদে পাবে। তাই চারটা আনারস অন্য নৌকা থেকে না বলে নিলাম। ওদেরতো অনেক আছে। হারাণ যে-পাটাতনের নিচে আনারস রেখেছিল সে পাটাতনের ওপর উঠে গেল। পাটাতন তুলে দেখাতে চাইলে ভুলুকে, কেমন ভাল ভাল আনারস সে এনেছে। কিন্তু খুঁজে দেখল আনারস সেখানে নেই। চোখ দুটা ওর জ্বলতে থাকল।—আমার আনারস কে নিয়েছিস বল?

হারাণের চোখদুটো দেখে ভুলু ভয় পেয়েছে। সে তাড়াতাড়ি বলে দিল, যখন তুই ঘুমুচ্ছিলি, আনারস চারটা কেরামতালী শেখদের নৌকায় তুলে দিলাম। কি দরকার ওসবের!

হারাণের এখন একমাত্র ইচ্ছা, বৈঠা তুলে ভুলুর মাথায় একটা বাড়ি দেয়। কি আমার সৎ মানুষরে! অসতের বাচ্চা! মনে মনে গাল দিল সে ভুলুকে।

নারাণ বৈঠা তুলে মাচানের ওপর রাখল। হারাণও রাখল তার বৈঠাটা। কৌটা খুলে কয়েকটা আরশোলা বের করল এবং টিপে টিপে মারল। যেন ভুলুর গলা টিপছে হারাণ। ওর রাগটা ক্রমশঃ নেমে এল। কয়েকটা আরশোলার মৃত্যুতে সে খুশী হয়েছে। মরা আরশোলাগুলোকে সে নারাণের হাতে তুলে দিল। নারাণ বঁড়শিগুলো ঠিক করছে। বঁড়শির সঙ্গে আশি হাতের মত টোন সুতা। প্যাঁচ খাওয়া-জড়ানো। মাথায় একসঙ্গে চারটা বঁড়শি বাঁধা।

চারটা বঁড়শি মাছের মাথায়, মুখে, ঠোঁটে, গলায় বিঁধবে। মাছটার আর ক্ষমতা থাকবে না ভাল করে নড়বার। দুটো দুটো করে সীসের মার্বেল পরিয়ে দিল বঁড়শির গলায়। সে এখন বঁড়শিতে তিনটে তিনটে করে আরশোলা গাঁথছে।

নারাণকে এসময় দেখলে মনে হবে সমস্ত সুখ-দুঃখ থেকে সে বিচ্ছিন্ন। এখন ওর মনের ভিতর একটি ঢাইন মাছ বাদে অন্য কিছু আশা আকাঙ্ক্ষার কথা নেই যেন। নিচের ঠোঁটটা সে দাঁত দিয়ে চেপে রেখেছে। চোখদুটো ওর উজ্জ্বল। কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে। শঙ্খিনীর ফোঁস ফোঁস শব্দ সে এখন শুনতে পাচ্ছে না।

লাল আকাশ আবার ধূসর হয়ে গেল। বৃষ্টি-বৃষ্টি ভাব। উত্তর থেকে মেঘেরা সব উঠে আসছে। আকাশ কালো করে ওরা দক্ষিণে রওনা হয়েছে। দক্ষিণ থেকে আরো দক্ষিণে। কিংবা এখনই হয়ত বৃষ্টি নামবে, ঝড় উঠবে। শিকারীরা যে যার বৈঠা পাটাতনে তুলে দিল। শুধু হালের বৈঠা উঠল না। ওরা নৌকার মুখ ফিরিয়ে দিয়েছে। এখন ওরা দক্ষিণমুখো চলবে। ওরা এবার সকলে ভাটার মুখে নৌকা ছেড়ে দিল। নদীর গর্ভে এক-এক করে হাজার বঁড়শি নেমে গেল। চল্লিশ, ষাট, আশি হাত নিচে নেমে বঁড়শিগুলো স্থির হতে হতে কাঁপতে সুরু করল। স্রোতের মুখে নদীর অতলে মরা আরশোলাগুলো নাচছে। বড় বড় ঢাইন মাছেরা নদীর অতলে পাথরের গায়ে অথবা কোন ভাঙা কোঠাবাড়ির কার্নিশের মাথায় শ্যাওলা খেতে খেতে পচা আরশুলার গন্ধে পাগল হয়ে উঠবে। মাছগুলো ধীরে ধীরে খুব সন্তর্পণে বঁড়শির সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকবে। লেজ নেড়ে নেড়ে খুশী হবে। খাবে কি খাবে না ভাববে। তারপর এক সময় আনারস চুরি করার মত আরশোলা মুখে পুরে ঢাইন মাছটা পাগলের মত ভাটির মুখে ছুটতে থাকবে। জলের ওপর নৌকায় নৌকায় শিকারীদের মুখে তখন উৎকণ্ঠা, আনন্দ।—ঢাইন, ঢাইন! হাজার নৌকায় সে-কণ্ঠ মিলিয়ে যাবে। মিশে যাবে। সকলে চিৎকার করে বলবে—একটা ঢাইন আটকে গেছে। ওরা

সকলে দেখবে একটা নৌকা ছুটছে আর ছুটছে। চাইন মাছটার টানে নৌকাটা ক্রমশঃ দক্ষিণ থেকে আরো দক্ষিণে অথবা পুব থেকে আরো পূবে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

নারাণ, হারাণ মেঘনার ওপর ঝুঁকে আছে। ঈদা, কলিমদ্দি চাইন শিকারের এমন সব গল্প ওদের করেছিল। নৌকার শিকারীদের ভিতর মাছটা নিয়ে বিভিন্ন রকমের জল্পনাকল্পনা চলবে। ভাববে, এতক্ষণে হয়ত মাছটা নৌকার উপর তুলছে। ভাববে, ওরা হয়ত আবার উজান দেবে, বঁড়শি ফেলবে, ফের একটা মাছ তুলবে।

ভুলু দেখল মাঝ-গাঙ ধরে সুপুরীর খোলের মত নৌকাগুলো স্রোতের টানে বৈদ্যের বাজারের দিকে গিয়ে নামছে। কোন ডিঙিতেই মাছ আটকায় নি। মাছ বঁড়শিতে গাঁথলে ওরা জানতে পারত। কারণ সব শিকারীই বঁড়শি ফেলে জলের ওপর ঝুঁকে আছে। কোন শব্দ করছে না, কথা বলছে না, হারাণের মুখটা প্রায় জল ছুঁই-ছুঁই করছে। ওরা যেন মেঘনার জলে অনন্তকাল ধরে নিজেদের মুখ দেখে চলেছে। হঠাৎ নারাণ সোজা হয়ে বসল এবং বঁড়শিতে টান দিল একটা।

ভুলু সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকে বলেছে, কি রে মাছ খোঁট দিল ?

—না রে না, খোঁট দেয় নি। ঘাড় ধরে গেছে বলে একটু সোজা হয়ে বসলাম। কি রে হারাণ, কিছু মনে হচ্ছে ?

হারাণ ঠোঁট কুঁচকাল। সে খুব শক্ত করে সূতাটা ধরেছে।

নারাণ বঁড়শিটা তুলতে লাগল। বেশ জোর লাগছে তুলতে। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো নদীর জলে তারার মত ফুটতে থাকল। বৃষ্টির টুপটাপ শব্দ। অন্যান্য নৌকায় ছাতা রয়েছে। তারা ছাতা খুলেছে। ওদের ছাতা নেই, ওরা প্রাণ খুলে ভিজল। বঁড়শি তুলে নারাণ দেখল আরশোলাগুলো কেমন আছে। সাদা সাদা রঙ ধরছে আরশোলাগুলোর, জলে ভিজলে মানুষের পায়ের পাতা যেমন সাদা হয়।

সে বঁড়শি তুলে মুখের কাছে নিল। এবং আরশোলাগুলোর মুখে থুথু ছিটিয়ে বলল, থুঃ, ট্যাংরা লো পুঁটি লো আমার বড়শিতে খাবি লো না বলে, চাইন মাছ, বাইন মাছ, সব মাছের রাজা ; আমার বঁড়শির আরশোলা সবচেয়ে তাজা। খাবি! খাবি!! খাবি!!! তিনবার বলে বঁড়শি জলের ওপর ছুঁড়ে দিল। টুপ করে শব্দ হল তারপর নদীর অতলে হারিয়ে গেল।

ভাদ্র মাসের গাঙ। জলে টইটম্বুর। বষায় টইটম্বুর। এই বৃষ্টি এই রোদ, এই ঝড়। বৃষ্টি ছেড়ে গেছে, আবার রোদ উঠেছে আকাশে [illegible]! চড়া রোদ। শরীর থেকে বৃষ্টির জল সব শুকিয়ে গেছে। জামা প্যান্ট শুকিয়ে গেছে। গরমে ওরা আবার ঘামছে। মুখে ওদের লালচে রঙ। বৈদ্যের বাজারে নৌকা পৌছতে বেশী দেরি নেই। এখন পর্যন্ত একটা চাইন বঁড়শিতে ভিড়ল না। কিন্তু নারাণ সেজন্য আপসোস করল না। তিন দিনের জন্য ওরা গাঙে এসেছে। রোজ ওরা তিনটে উজান দিতে পারবে। সুতরাং সে বেশী আশা করে না। তেমন নসীব ওর নয় যে প্রথম উজানেই চাইন ধরা দেবে। তবে ত সে মাছের রাজাই বনে গেল!

ওরা তিনজনই চোখ তুলে বৈদ্যেরবাজারের ঘাট দেখল। সেখানে পৌছেই অন্য উজানে ফের পাড়ি দেবে। যে যার মত বঁড়শি তুলে দাঁড়ে বসবে। বাইচ খেলার মত কখনও বৈঠা তুলে হৈ হৈ করবে, দাড়ে টানবে—হে! হে! আর গান করবে, গহীন জলের মাছ রে…। ওরা ক্লান্ত হবে না সে গান গেয়ে। ওদের হাতের পেশী শক্ত হবে। ছপ ছপ করে বৈঠা পড়বে। সে এক বিচিত্র আওয়াজ। বিচিত্র অনুভূতি।

বৈদ্যেরবাজার মুহিনীখালের মুখে খড়া-জাল পেতেছে অঘোর জেলে। খড়া-জালে অঘোর ঝাক ঝাঁক নলা মাছ তুলেছে। মাছগুলো বড় বড়, কিন্তু বিক্রি নেই। ভাদ্র মাসে নলা মাছ কেউ খেতে চায় না। সস্তা! সস্তা! দু পয়সায় এক কুড়ি। এক কাঠা ধানে এক গলুই মাছ। কে খাবে? কে নেবে? অঘোর জেলের নৌকা

ডুবো-ডুবো। মাছে বোঝাই। কিন্তু কত আর দাম হবে। অঘোরের হয়ত আপসোস। এত মাছ! পয়সা এত কম। সে গল্প শুনেছে, কোথায় নাকি সের-দরে মাছ বিক্রি হয়। তেমন দেশের জেলে যদি সে হতে পারত!

নারাণ অঘোরকে চেনে! অলিপুরার বাজারে নারাণের বাবা অঘোরের কাছ থেকে মাছ নেয়। ভাল মাছ থাকলে অঘোর হাটে যাবার সময় নারাণদের ঘাটে নৌকা লাগিয়ে মাছ দিয়ে যায়। অঘোর কাঠা কাঠা ধান নেয় নারাণের মার কাছ থেকে। বাপের কাছ থেকে ফের পয়সা নেয়। অঘোর জেলে বলে—বাবুর মত মানুষ হয় না। মাছ কিনেন, পয়সা বেশী দেন। নারাণ ভাবল, অঘোর তুমি চোর। হারাণের মত চোর। মার কাছ থেকে কাঠা কাঠা ধান নেবে, ফের অলিপুরার বাজারে বাবার কাছ থেকে পয়সা নেবে।

এমন সময় ওরা শুনল। প্রথম একটি শব্দ। শেষে অনেক শব্দ। ঢাইন ঢাইন। নৌকায় নৌকায় সে কথা ছড়িয়ে পড়ল। গরীপড়দীর ধানু শেখের বঁড়শিতে ঢাইন আটকেছে। নৌকার শিকারীরা মুহূর্তের জন্য চঞ্চল হল, নিজেদের বঁড়শি থেকে চোখ তুলে মেঘনার বুকে হাজার নৌকার কোন্ নৌকায় ধানু শেখ আর তার মাছটা ছুটছে তাই দেখার জন্য উন্মুখ হল তারা।

হারাণ বলল, ঐ ঐ নৌকা ছুটছে।

ভুলু বললে, এবং পাশের নৌকার লোকেরা বললে, কোন্ নৌকা? কোন্ দিক?

—ঐ ঐ দেখছিস না। হারাণ বলতে বলতে দাঁড়িয়ে গেল।

নারাণ চোখ তুলে দেখল সব নৌকাগুলো যখন উজান বাইছে তখন একটিমাত্র ডিঙ্গি ভাটার মুখে ক্রমশঃ নদীর নীচে গিয়ে নামছে। গরীপড়দীর ধানু শেখ, মানুষটা জানি কেমন, নারাণের ইচ্ছা হল একদিন গরীপড়দী গিয়ে ধানু শেখকে দেখে আসবে। মাছটা হয়ত অনেক বড়।

হারাণ হালে বসেছে। দাঁড় টানছে ভুলু। বঁড়শির সুতাগুলো পাটাতনের ওপর গোল গোল প্যাঁচ দিয়ে নারাণ সাজিয়ে রাখছে। সাদা রঙ ধরা আরশোলাগুলো জলে ফেলে দিল। এতক্ষণ পর সে শঙ্খিনীর ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনতে পেল। পাটাতনের নীচে ছোবল মারছে। নারাণ ভাবল, ধান্নু শেখ কি তবে মাছের রাজা! মেঘনায় এসে সে মাছ প্রথম পেল। শঙ্খিনীর হাড় হয়ত তার গলায় ঝুলছে।

সাপটার ওপর মনে মনে বিরক্ত হচ্ছে নারাণ। আর একমাস আগে যদি সাপটাকে চাঁইয়ের ভেতর পেত। অমাবস্যা, পূর্ণিমা দেখে মেরে কবর দেওয়া যেত তবে। অবশ্য আড়ালে কবর দিতে হত। কারণ অন্য কেউ দেখে ফেললে চুরি করবে হাড়গুলো। কোমরে কিংবা কনুইয়ে বেঁধে সাপের ভয় থেকে মুক্তি পাবে।

নারাণ রীতিমত একটা উত্তেজনা অনুভব করল। সে এ-সাপটাকে মেরে অমাবস্যা পূর্ণিমায় যখন গোর দেবে, দেখবে তখন কার এত সাহস যে হাড়গুলো চুরি করে। খেজুরগাছটার নীচে রাতের অন্ধকারে সে পাহারা দেবে। অন্ধকারে চোরের গলা চেপে ধরে বলবে চোর, চোর! হারাণের মুখটা নারাণের চোখে ভেসে উঠল: হারাণ চোর। মাছের রাজা হওয়ার শখ হারাণের ষোল-আনা। চুরি করলে হারাণই করবে। হারাণের গলাটার দিকে ত্যারচা করে চাইল নারাণ। চোরের গলাটা চাকু দিয়ে কাটবে। গলাটা ভাল করে দেখে নারাণ যেন নিশ্চিন্ত হল।

সে আরো ভাবল, আগামী বর্ষায় যখন এ নদীতে চাইন শিকারে আসবে, যখন শুনবে নদীতে জো পরছে চাইন শিকারের, তখন ডেঙ্গুরে-জ্যাঠার নাম করে গলায় শঙ্খিনীর মালাটা পরবে। আর মেঘনার বড় চাইনটা সে-ই প্রথম ধরবে। হাজার ডিঙির মানুষেরা মেঘনায় বলাবলি করবে, প্রথম বড় চাইন মাছটা আটকিয়েছে সম্মান্দীর ডাক্তারবাবুর ছেলে নারাণ। এবারের মাছের রাজা নারাণ।

নারাণ এবার বৈঠা ফেলল জলে। সব নৌকাগুলো নদীর ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। মাত্র একটি কোষা-ডিঙি ক্রমে সুদূরে দক্ষিণ

থেকে দক্ষিণে চলে যাচ্ছে। সেখানে আছে ধান্নু শেখ, ধান্নু শেখের গল্প এখন নৌকায় নৌকায়। মানুষটা মাছের অলিগলি সব চেনে। গরীপড়দীর ছাগল-বামনী নদীতে মানুষ বলাবলি করছিল কুমীর এসেছে। ধান্নু কিন্তু দূর থেকেই বুঝেছে ওটা বোয়ালের মাথা। রাতে লণ্ঠনের আলোয় ধানক্ষেতের আলে হাঁটু-জলের ভিতর থেকে কুমীরের মত মাছটাকে শিকার করেছিল। গ্রামে গ্রামে সেটা গল্পের মত হয়ে অনেক কাল পর্যন্ত ঘুরেছে। একটা শিঙি কোঁচ দিয়ে এত বড় মাছটাকে সে জব্দ করেছিল। শুনে আশ্চর্য হয়েছে নারাণ। ঈদা বলেছে, ওরা সেদিন রাতে গরীপড়দীর হাট করে নৌকায় ফিরছে। আঁধার রাতে চিৎকার শুনেছিল তারা, ধান্নু শেখ চিৎকার করছে, ও মিঞা, নৌকাটা মেহেরবানী করে ভিড়াবেন এদিকটায়।

ধান্নুর লণ্ঠন জলে পড়ে নিভে গেছে। ধানক্ষেতের ভিতর হাঁটুজল। আলে জল একটু বেশী। ধান্নু সেখানেই দাঁড়িয়ে বলছে, একবার দেখেন, আপনাদের নৌকার হ্যারিকেনটা নিয়ে দেখেন। দেখেন কি একটা ধরেছি।

হ্যারিকেনের আলোয় ঈদা দেখল একটি কালো কুচকুচে কচ্ছপের মত পিঠ।—কাছিম ধরলেন বুঝি?

—তোবা, তোবা! কি যে কথা কন্। বোয়ালের মাথাটা দেখে বুঝলেন কাছিম ধরেছি। হ্যারিকেনটা ওপরে না তুলে পাশে রাখেন, দেখবেন কত বড় মুখ, আর কত বড় দাড়ি।

ঈদা মাছের রকম দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। অন্যান্য সকলকে বলেছে, বাজীরে বাজী, কি তাজ্জব কাণ্ড! আমার গোটা মাথাটা বোয়ালের মুখে ঢুকে যাবে।

মাছটা নদী থেকে মাঠে উঠে এসেছিল। তারপর সড়ক ধরে জলের নীচে পচা কেঁচো খেতে খেতে কখন একসময় ধানক্ষেতের আলে এসে মুখটা হাঁ করে পড়ে রয়েছে। ছোট মাছ, বড় মাছ স্রোতের সঙ্গে মুখে যা ঢুকেছিল সবই বোয়ালটা গিলছিল। ধান্নু শেখ জোয়ারের জলে লণ্ঠনের আলোয় ট্যাংরা মাছ, শিঙি মাছ খুঁজতে বের

হয়েছে। ধানক্ষেতের আলে এসে হাঁড়ির মত মুখটা দেখল। জলের নিচে মুখটা একবার হাঁ করছে, ফের বন্ধ করছে। ধান্নু শেখ প্রথম ভয় পেয়েছিল। পরে বুঝেছে নদীর সেই কুমীরের মত বোয়াল মাছটা। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবল আর ভাবল। মাছটা নড়ছে না। ওর ভয় হোল, মাছটা যদি পায়ে এসে কামড়ে ধরে এবং নদীতে টেনে নিয়ে যায়। ভয় পেয়েই সে কোঁচটা মাছটার ঘাড়ে বসিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গেই মাছটা পল্টন খেয়ে ধানক্ষেতের ভিতর ঢুকে গেল এবং ভুল করল। ধানক্ষেতের আলি ঘন। মাছটা ভাল করে নড়তে পারল না। ধান্নু শেখ মাছটাকে ঠেলে ঠেলে আধা জলে আধা মাটিতে চিৎ করে দিল। ধান্নু শেখের কপাল আজ সেই ধান্নু শেখ মেঘনার প্রথম চাইন ধরেছে। আবার হয়ত আর একটা গল্প গ্রামে গ্রামে প্রচার হবে। নারাণ জোরে দাঁড় টানতে থাকল। বার বার সে রূপালী জলে চোখ মেলল। সে মনে মনে বলছে এখন, মেঘনা, তুমি আমাকে একটা চাইন দিও। বেশী চাই না। একটা দিলেই খুশী হয়ে বাড়ি চলে যাব।

আকাশে এখন আর এতটুকু মেঘ নেই। ওরা তিনজন এই আকাশ দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারল এটা শরৎকাল। শরৎকাল আরম্ভ হয়েছে। বাতাস খুব জোরে বইছে। কোষা-নৌকা বড় বেশী ঢেউয়ের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে। ওরা ঠিকমত পাটাতনে বসে থাকতে পারছে না। বাতাসে ওদের চুল উড়ছে।

হারাণ ভাবল, ধান্নু শেখ যদি তাদের গ্রামের হত কিংবা সে যদি ধান্নু শেখের নৌকায় থাকতে পারত! ভাগের ভাগ সের পাঁচেক মাছ পেলেও ওর মা টুসটুসি খুব খুশী হত। তবে শুকিয়ে রাখার মত মাছ উদ্বৃত্ত হত না।

ভুলু বুঝতে পারল না, ধান্নু শেখের নৌকাটা মাছে টেনে নিয়ে যাচ্ছে না স্রোতের টানে নৌকাটা বিন্দুবৎ হয়ে গেল। যদি মাছটার শক্তি ধান্নু শেখের চেয়ে বেশী হয় তবে মাছটাকে নৌকায় তুলবে কি করে! ধান্নু শেখ কেমন মানুষ? নূর আছে? মুখটা হয়ত চৌকো

কিংবা বাংলা পাঁচের মত। ঈদার মত দেখতে। কলিমদ্দির মত মাথায় টাক নেই ত!

একটা নৌকা গেল তাদের পাশ দিয়ে। নৌকাতে ছই আছে। নৌকার ভিতর ছোট বড় অনেক মানুষ। দুজন মাঝি। গলুইয়ে বসে একজন মাঝি হুঁকো সাজছে। অন্য মাঝি হালে বসে বাদাম তুলেছে। ছই-এর ভিতর থেকে ছোটবড় মানুষগুলো উঁকি দিয়ে আছে। ফ্রক গায়ে-দেয়া মেয়েটার উৎসাহ বেশী। আনন্দ বেশী। হাজার ডিঙির ঢাইন মাছ ধরার উত্তেজনা যেন ওকেও পেয়ে বসেছে।

হালের মাঝি গান ধরেছে, মনের আগুন, জ্বলছে দ্বিগুণ, আগুন নিভে না জ্বলে, মনের দুঃখ কারে বলি ওলো সই ললিতে।....

এই মাঝি, এই নৌকা, ছইয়ের ভিতর মানুষগুলো ভুলুকে যমুনা-পিসির কথা মনে করিয়ে দিল। অনেক সুখ-দুঃখময় আনন্দের কথা ভাবতে ভাবতে সে হালে চলে এল। হারাণ উঠে গেল দাঁড়ে। ভুলু হালে বসে এক গণ্ডূষ জল মাথায় দিল। বলল, বারদী পর্যন্ত আর উজান বাইব না। দামোদরদী পর্যন্ত উজান টানলেই চলবে। নসীবে থাকলে ঢাইন আমরা এ নদীতেই পাব। বারদী পর্যন্ত উজান টানলে হাতে ফোসকা পড়বে।

—তাই হবে। নারাণও মনে মনে এই কথাগুলোই ভাবছিল।

হারাণ অনেকক্ষণ থেকেই একটা কথা বলবে ভাবছিল। ধানু শেখের ঢাইন মাছ আটকানো থেকে সে যে কথাটা ভাবছে। এবার সে কথাটা পাড়ল, ঢাইন মাছের ভাগ কিন্তু সমান সমান হবে।

নারাণ, হারাণের কথা শুনে ক্ষেপে উঠল।—আগামীবার তোকে আর আনব না হারাণ। তুই বড় স্বার্থপর। সমান দিলে শংকরী বৌদি, খুশি, আরতি ওদের কোত্থেকে দেব? ওদের দিয়ে যা থাকে তাই আমরা ভাগ করে নেব। তুই কি ভাবিস কেবল টুসটুসিকে মাছ খাওয়াবার জন্য এতদূর থেকে ঢাইন ধরতে এসেছি। তেমন কথা মনেও স্থান দিস না।

ভুলু হাসল। চাইন মাছ এখন ওঠে নি, শেষ পর্যন্ত উঠবে কি না তাও ঠিক নেই। ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে এখন থেকেই ঝগড়া শুরু। অনেক নৌকাই মাছ শিকার করতে পারবে না। এবং সেই নৌকাগুলোর ভিতর তাদের নৌকাটা থাকার সম্ভাবনা বেশী। এবার ভুলু ধমক দিল, মাছ আগে নৌকায় উঠুক। তখনই ভুলু দেখল ফ্রক-গায়ে-দেয়া মেয়েটা ছই-এর ওপর হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝবয়সী একটা বিধবা বৌ মেয়েটার হাত ধরে টানছে। ছই-এর ভেতরে ঢুকতে বলছে। নদীতে ভীষণ ঢেউ। কাত হয়ে জলে পড়লে রক্ষা নেই। স্রোতে ঘূর্ণি ভয়ানক। জলের রং দীঘির মত কালো। বিধবা বৌটার হয়ত ভয় ধরেছে। যমুনা-পিসির মত হয়ত বলছে, দেখেছ বৌ, মেয়েটা কত অবাধ্য, পাজি—হতচ্ছাড়া! এত টানলাম তবু ছই-এর ভিতরে এল না।

যমুনা-পিসি বলত, দেখছ বৌ, তোমার ছেলেটা আমার টিকি ধরে টানছে! কি মজা পেয়েছিস রে হতভাগা!

যমুনা-পিসির কথা শুনে ভুলু হাসত। মা ধমক দিলে ভুলু বলত, আমি কি বুড়ীর টিকি টানছি। তুমি যে কি বলছ মা! পিসির পাকা চুল আনছি একটা একটা করে।

—দেখছ বৌ, হতচ্ছাড়া কি পাজি! তুমিও পিসি ডাকবে, তোমার ছেলেও পিসি ডাকবে!

ভুলুকে ধমক দিতেন মা, তোমায় কতবার বলেছি দিদু বলে ডাকবে। তিনি তোমার দিদি হন, পিসি নন।

ভুলু জিদ ধরত তখন,—তুমি পিসি ডাক কেন মা? তুমি ডাকলে আমিও ডাকব। আমি দিদু ডাকলে, তোমায়ও দিদু ডাকতে হবে।

মা তখন আরো রাগ করতেন। সে সময় যমুনা-পিসি বলতেন, থাক বৌ থাক। ওকে পিসিই ডাকতে দাও। তোমার ছেলে যদি তোমার বিয়ে দেখে থাকতে পারে, তবে সে আমায় পিসিও ডাকতে পারে।

এ-সব কথাগুলো যখন ভুলুর মনে হয় তখন সে নিজেকে খুব ছেলেমানুষ ভাবে। সে বয়সে ওর মনের পরিধি কত সীমিত ছিল। মাকে সে বলত, তোমার বিয়ে আমি দেখেছি, না মা? মা একবার হেসে বলেছিলেন, হ্যাঁ দেখেছ। সেই থেকে সে সকলকে বলত, জানিস মার বিয়ে আমি দেখেছি। কিন্তু আজ নৌকার ফ্রক-গায়ে মেয়েটাকে দেখে সে অন্য কথা ভাবতে শিখেছে। অন্য কথা বলতে শিখেছে। নিজের সেই বয়সের ছাপটাকে মুখের রেখা দিয়ে ঢাকতে চাইছে।

ভুলু এ-সব কথাগুলো ভাবল, যখন মাঝগাঙের ওপর নৌকা। সে হালে বসে যাত্রী-নৌকাটা দেখতে দেখতে একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল। যমুনা-পিসি, মা, বাবা পাগল-জ্যাঠামশাই, ঠাকুর্দা সকলের মুখগুলো একসঙ্গে জলের ওপর ভাসতে দেখল। যমুনা-পিসিই তাকে মধুমালার গল্প শুনিয়েছিলেন।

যমুনা-পিসির মাথায় টিকি। টিকিটা লম্বা। পিঠের ওপর টিকিটা ঘোড়ার লেজের মত নড়ত। মাথায় কি রোগ ছিল পিসির! মাথাটা কেবল নড়ত। টিকিটাও নড়ত। ঠাকুমার (বাবার মা) পাশে বসে সারাদিন হুঁকো সাজতেন, হুঁকো খেতেন।

ঠাকুমা বলতেন, হুঁকোর জল তেতো লাগছে কেন রে! জল বুঝি বদলাস নি?

যমুনা-পিসি চুপ থাকতেন তখন।

ওরা হুঁকো খেত। বিকেল বেলায় ওরা উঠোনের পাশে ডেকলগাছটার ছায়ায় বসত। গরমের দিনে শীতল-পাটি বিছিয়ে বসত। ভুলু রামায়ণ পড়ত দুলে দুলে। যমুনা-পিসি রামায়ণ শুনে কাঁদতেন। লক্ষ্মণ-বর্জনে এলে পিসির ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নাটা ভুলু এখন মনে করতে পারছে। ভুলুর চোখদুটোও কেমন করুণ হয়ে উঠত তখন। ঠাকুমার চোখেও জল। বাড়িতে একটি পাগল মানুষ রয়েছে, সেজন্য বুঝি সকলের সেই কান্না। বাড়ির পাশ দিয়ে পথ গেছে টোটার-বাগ। সেখান থেকে রনা-ধনা আসত। মা-ঠাকুরমা

থেকে অনেক দূরে বসে ওরাও রামায়ণ শুনত। ওরাও কাঁদত। রনা-ধনা কাঁদলে মুখটা অদ্ভুত দেখাত।

রনা-ধনা বাড়ির বড় ডিঙির মাঝি ছিল। জোয়ান মানুষ ওরা। গ গ করে কথা বলত। মামা-মামী ডাকত বাবাকে-মাকে। অভাবে অনটনে মামা-মামীই দেখাশোনা করতেন তাদের। ওদের বৌ, কেটি আর জোটন বিবি বাড়ির ঢেঁকিশালে থাকত সমস্ত দিনমান। ধান ভানত, বদলে খুদকুঁড়ো নিত। চাল চুরি করত তুঁষের সঙ্গে। কেটি বিবির মুখে বসন্তের দাগ। একটা চোখ বসন্তে পচে গেছে। অন্য চোখটা নীল-নীল।

সেই কুয়োতলা আর বাঁশঝাড়। সব সে মনে করতে পারল নৌকার গলুইয়ে বসে। তেঁতুলগাছটার নীচে বাড়ির দক্ষিণের ঘাট। পুঁটি মাছ, ট্যাংরা মাছ, এলকোনা মাছ ঘাটে—ঘাটের শাপলা পাতায় জলপিপি। পুকুরপাড়ে প্রকাণ্ড অর্জুনগাছ—গাছের নীচে ঠাকুর্দার শ্মশানের মন্দির। মৃত্যুর আগে পাগল-জ্যাঠামশাই সেই অর্জুনগাছটার নীচে বসে থাকতেন কেবল। ঠাকুর্দার মৃত্যুর দিনেও অর্জুনগাছটার নীচে ভুলু শেষবারের মত পাগল-জ্যাঠামশাইকে দেখেছিল। তেমন দশাসই মানুষ পৃথিবীতে আর কটা আছে! মাঝগাঙে চোখ তুলে সে যেন তেমন মানুষকেই খুঁজল। একসময় বলল, নারাণ, তুই আমার বড়-জ্যাঠামশাইকে দেখেছিস? পাগল হওয়ার পরও তিনি সম্মা[illegible] যাতায়াত করতেন।

—তোর জ্যাঠা? সেই পাগলা-জ্যাঠা!

—নারাণ!

নারাণ বিস্মিত হল ভুলুর চোখ দেখে। সে চোখ জলে ছলছল করছে। নারাণ হঠাৎ গলাটা কোমল করে বলল, তোর বড়-জ্যাঠামশাইকে আমি দেখি নি।

হারাণ বলল, তোর বড়-জ্যাঠামশাই ত কলকাতার মেমকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। তোর ঠাকুর্দা তার করলেন, তুমি এস, আমার

অসুখ। তিনি এলেন, তারপর তোর জ্যেঠিমার সঙ্গে বিয়ে হল। বিয়ের রাত থেকেই ত পাগল।

ভুলুও এমন সব অনেক কথা শুনেছে। শুধু সম্মান্দী গ্রামে নয়, সাত মাইল দূরে তার নিজের গ্রামেও। ঠাকুর্দা পাগল-ছেলে এবং তার বউকে নিয়ে সম্মান্দী থেকে রাইনাদীর বাড়িতে চলে গেলেন। ছোটছেলেরা সম্মান্দী থেকেই লেখাপড়া শিখতে থাকল। পরে তাঁরাও রাইনাদীতে ঠাকুর্দার কাছে চলে গেলেন। ঠাকুরর্দার ছোট তিন ভাই সম্মান্দীতেই থাকল—এসব কথাগুলো সে সোনা-জ্যাঠামশাইয়ের মুখ থেকে জেনেছে।

ভুলু ভাবল, নারাণ তুই পাগল-জ্যাঠামশাই বল। সেই পাগলা বলবি কেন! জ্যাঠামশাই কি তোর ছোট? পাগল-জ্যাঠামশাই খুব ভালমানুষ। সমস্ত দিন বৈঠকখানার দাওয়ায় বসে থাকতেন। দুটো হাত কচলাতেন আর ইংরেজীতে কার সঙ্গে যেন সব-সময় কথা বলতেন। ওঁর শূন্য চোখ দুটো কি যেন সর্বদা খুঁজত। ভুলু এখন ভাবতে পারছে—বুঝি সেই মেমকে। তখন ওর কাছে ওটা কি যেন অচেনা একটি শব্দ। এই মেম কথার অর্থ এখন সে যত ভাল বুঝতে পারে তখন তা পারত না। তখন পারত না বলেই মেম মেয়েমানুষ এই পর্যন্ত সে জানত। সেই বয়সে মনে হয়েছে মেম ডাইনী। ঠাকুর্দা জ্যাঠামশাইকে বিয়ে করতে না দিয়ে খুব ভাল করেছেন। কিন্তু এই বয়সে মেমকে সে ভাল ভাবে চেনে। একবার সে তাদের স্কুলে মেম দেখেছেও। তাছাড়া ভূগোল বইয়ের পাতায় অনেক দেশের নাম সে শিখেছে। সেই সমস্ত দেশে অনেক মেমেরা থাকে। মেম—রাজার দেশের মেয়ে। কি ভুলই না করেছেন ঠাকুরর্দা। চোখ নীল-নীল। চুল সোনালী, গোলাপী রঙের মেয়ে। বাদশা-বেগম চেহারা। তেমন একজন জ্যেঠিমা হত, জ্যেঠিমা বলে ডাকতে পারত সে। তার আধো আধো কথা তিনি নিশ্চয়ই বুঝতেন।

বড়ছেলে পাগল হল বিদেশে পাঠিয়ে, ছোটছেলেদের আর সেজন্য পড়ালেন না। বিদেশে পাঠালেন না। বাড়ির কাছে জমিদারী

সেরেস্তায় ছেলেরা কাজ করে রোজগার করুক, এই তিনি চাইতেন। সোনা-জ্যাঠামশাই বলতেন, আমাদের আর জাঁকজমক থাকল না। সেই থেকে বাড়ির সকলে কেমন মনমরা হয়ে গেল। আমরা জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করতে ঢুকলাম, তোর বাবাও ঢুকল। পূজোর বন্ধে ভুলু যখন রাইনাদীর বাড়ি যায় তখন এমন সব কথা সোনা-জ্যাঠামশাই তাকে এখনও বলেন।

ভুলু তখনও বড় হয় নি, তখনও অনেক ছোট। তখন বর্ণপরিচয় থেকে আদর্শলিপি। পূজোর বন্ধ—সে এক বিস্ময়! পূজোর বন্ধে জমিদার-বাড়ি থেকে নৌকা আসত। সোনা-জ্যাঠামশাই নৌকা ভরে সওদা পাঠিয়ে দিতেন। পাঠান শেখ মাঝি আসত। সে খেতে বসত পাছদুয়ারে। পাঁচজনের ভাত সে একা খেত। শেষে বড় এক ঘটি জল খেয়ে বলত, বড় গরম পড়েছে ঠারান, মুখে ভাত আর রোচে না। পেট ভরে দুটো খেতে পর্যন্ত পারি না। মা-জ্যেঠিমা, তাঁরা তখন খিল খিল করে হাসতেন। বলতেন, পাঠান কি বলছ তুমি!

নৌকায় করে ওরা চারজন (ভুলু এবং তার জ্যাঠতুতো খুড়তুতো ভাই) মুড়াপাড়া যেত পূজো দেখতে। সোনা-জ্যাঠামশাই সোনার মানুষ। তিনি জমিদার বাড়ির একান্ত আপনজন। ভূঁইঞামশাই, বাড়ির ছেলেরা ডাকত ভূঁইয়া কাকা। ওরা চারজন জমিদার-গিন্নিকে ডাকত—জ্যেঠিমা। ডাকটা মিষ্টি মিষ্টি। দশমীর দিনে তিনি সকলকে একটা করে চকচকে টাকা দিতেন। হাতির পিঠে মাহুত বসত, রামসুন্দর পেয়াদা থাকত আগে। ওরা চারজন হাতির পিঠে চড়ত; কমলা, গৌরী উঠত, মেজদা সেজদা (জমিদারপুত্র) উঠতেন। হাতির পিঠে চড়ে ওরা দুলে দুলে দশমী দেখতে যেত।

নৌকার ফ্রক-গায়ে-দেয়া মেয়েটাকে দেখে ভুলু সব কথাগুলোই এক এক করে মনে করতে পারল। সেই গৌরী হয়ত এখন অনেক বড় হয়েছে। নৌকার মেয়ের মত সে হয়ত শীতলক্ষার বুক বেয়ে ঢাকা যায়। স্টিমারের ডেকে দাঁড়িয়ে নদীর চরে এখন হয়ত সে পানকৌড়ীদের সাঁতার দেখে। শীতলক্ষার চরে কাশবনের ঝোপে

এখন হয়ত সে একা প্রজাপতি ধরতে যায় না, কিংবা একা একা প্রজাপতির পিছনে দৌড়ায় না। ওর যেমন কতকগুলো অনুভূতি দিন দিন এক আশ্চর্য পৃথিবীর দরজা ওর সামনে খুলে ধরছে, প্রজাপতির দেশে গৌরীও হয়ত তেমন এক রহস্যের সন্ধান পেয়ে নিজের জানালাটায় দাঁড়িয়ে সেই আশ্চর্য পৃথিবীকে উঁকি দিয়ে দেখছে।

খুব রোদ। ভাদ্র মাসের রোদে গা জ্বালা করছে। সে এক হাতে জল তুলে গায়ে মেখে নিচ্ছে, অন্য হাতে হালটা শক্ত করে ধরে আছে। যখন সে জলটা মুখে ঘাড়ে মেখে নেয় তখন শরীরটা ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা মনে হয়। বাতাস ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা মনে হয়। নারাণ হারাণ দাঁড় টানছে। ওর ইচ্ছা হল উঠে গিয়ে হারাণকে কিংবা নারাণকে হালে পাঠিয়ে সে একটু দাঁড় টানে। কিন্তু ওদের কেউ হাল ভাল ধরতে জানে না। প্রবল স্রোতের মুখে নৌকা ঘুরে যাবার সম্ভাবনা থাকে। নারাণ তার জ্যাঠামশাইকে বলেছে—সেই পাগলা। কথাটা সে ভুলতে পারছে না। তেমন কথা বলিস না নারাণ, আমার কষ্ট হয়। আমাদের সংসার বড় কষ্টের সংসার। সে দিন আর আমাদের নেই। কাকীমা ত সেইজন্যই আমাকে আজকাল বড্ড খাটায়। বাবার ত ইচ্ছা নয় আমি খুব লেখাপড়া শিখি। ভয়, যদি বেশী লেখাপড়া শিখে পাগল হই। বংশটা আমাদের অভিশপ্ত। যে পড়াশোনা করে বড় হবে, তার সর্বনাশ হবে, তার অঘটন ঘটবে। চার পুরুষ থেকে এই চলে আসছে। মা অন্য রকমের। তিনি বলেন, ভুলু, তুমি মানুষের মত মানুষ হবে। সে জন্যই মা সন্ন্যাসী এসে সেদিন প্রথম বলেছিলেন, ভুলু, তোর এখানে থাকবে চারু, স্কুলে যাবে, ওকে একটু দেখিস। ছেলের মত করে দেখিস।

কাকীমা বলেছিলেন, দিদি, আমার এক ছেলে। ওর মর্জি অনেক। ওর মত করে কিন্তু তোমার ছেলেকে দেখতে পারব না। ওকে সব সময় দুধ-ঘি দিতে পারব না। সময়-মত রান্না না হলে

পান্তাভাত খেয়ে স্কুলে যেতে হবে, এই নিয়ে পরে আমাকে আবার কথা শোনাতে পারবে না।

—তা যাবে। ও পান্তাভাত খেয়েই যাবে।—ভুলুকে মা বলেছিলেন, তুমি কিন্তু কাকীমা যা বলবে শুনবে। কাকীমার অবাধ্য হলে আমি খুব দুঃখ পাব।

ভুলু তখন মাথা নেড়েছিল—কোনো জবাব দেয় নি। অবশ্য সে-কথা সে আজও রেখেছে। ভবিষ্যতেও রাখবে।

মেঘনার এ-পারের তীর খুব ভাঙছে। খুব উঁচু তীর। দুবিঘে তিনবিঘে জমি ধরে ফাটল। তীর ঘেঁষে তাই নৌকা যাচ্ছে না। একটা হাঁড়ির-নৌকা অন্য তীরের জন্য গুড়াতে বাদাম চড়িয়েছে। ওরা গাঁয়ে গাঁয়ে ধান নেবে, হাঁড়ি বিক্রি করবে।

ছই-দেয়া নৌকা, ফ্রক-গায়ে-দেয়া মেয়ে বাঁকের মুখে হারিয়ে গেছে। কিন্তু অনেকগুলো কেঁড়ায়া-নৌকা বাঁকের মুখ থেকে উঠে আসছে। ওরা কতদূর যাবে? অনেক দূর। হয়ত অনেক যাত্রী ওখানে, বিয়ের যাত্রী। গয়না-নৌকার মত নৌকা, তেমাল্লা চৌমাল্লা। রাঙাকাকার বিয়েতে এমন নৌকায় করেই সে বরযাত্রী গিয়েছিল।

এই নদীর ওপর অনেক গয়না-নৌকা—গোপালদির গয়না, ফাঁওসার গয়না, দুপতারার গয়না। এ-গাঙ ধরে গয়না যাবে ঢাকা, নারাণগঞ্জ। গ্রাম থেকে ওরা ডেকে যাত্রী তুলে নেয়। মানুষগুলো নারাণগঞ্জ, ঢাকা গিয়ে কোর্ট-কাছারি করবে। মামলা-মোকদ্দমা করবে। গয়না-নৌকাগুলোকে নদী ধরে সে যেতে দেখল। ওদের চাকর রনা-ধনা আগে গয়না-নৌকার মাঝি ছিল; ওদের গয়নায় ডাকাত পড়েছিল একবার। ধনার একটা পা কেটে দিয়েছে ডাকাতেরা। ধনা এখন সেজন্য লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটে। কিন্তু নৌকায় দাঁড় টানতে পারে সকলের চেয়ে বেশী। পায়ের সকল শক্তি যেন ওর হাতে এসে জমেছে।

পৌষ মাস থেকে ধনার হাতে নৌকার কাজ থাকে না। তখন সে বাঁশ কেটে চাঁই, পল, ওছা বানাবে উঠোনের ওপর বসে।

কার্তিক অগ্রাণ মাসে মাঠ থেকে জল নেমে যায়। মাঠে হাঁটু-জল, কোমর-জল থাকে তখন। পাটের জমি সব। জলের নীচে শাপলা শ্যাওলার জঙ্গল বেঁধেছে। দামের নীচে পুঁটি মাছ বইচা মাছ লেজ নেড়ে নেড়ে শ্যাওলা খায়। ভুলুকে একবার একটা ছোট ওছা ধনা তৈয়ের করে দিয়েছিল। সুবোধ, মনা, কালপাহাড়ের সঙ্গে ভুলু ওছা নিয়ে কতবার মাঠে বইচা মাছ ধরতে গেছে। ওরা দামের ভিতর ওছা পেতে দূর থেকে জল ছিটাত। আর বলত, ইচাঁ-লো, বইচা-লো আমার ওছায় উঠিস লো! মাছ ধরার সে এক বিচিত্র উত্তেজনা। কিন্তু আজকের এই চাঁইন মাছ ধরার উত্তেজনা যেন আরো অনেক বেশী। গভীর কালো জল, নীচে পুরনো জনপদের পাহাড়, ভাঙা পাঁচিল—তার ফাঁকে ফাঁকে চাঁইন মাছেরা পুঁটি মাছের মতই হয়ত সন্তর্পণে উজানে জল কাটছে। ধানু শেখ হয়ত এতক্ষণে মাছটা নৌকায় তুলে ফেলেছে।

আকাশ এখন খুবই পরিষ্কার। এক টুকরো মেঘ নেই। আকাশের মেঘের দলটা দক্ষিণ থেকে দক্ষিণে হারিয়ে গেছে—অন্য কোনো মোহানায়, অথবা অন্য কোনো সওদাগরের দেশে। সওদাগরের ছেলে মদনকুমার—পাগল মদনকুমার। যমুনা-পিসি নৌকায় গান ধরতেন, স্বপ্নে দেখি মধুমালার মুখ। পাগল-জ্যাঠামশাইও হয়ত স্বপ্নে সেই মেয়ের মুখ দেখতেন। চমকে উঠতেন তিনি, আকাশের নক্ষত্র দেখতেন। আর হাত কচলে ইংরেজীতে সমস্ত দুনিয়াকে শাপ-শাপান্ত করতেন কিংবা শেলীর কবিতার দুটো চরণ মনে মনে আওড়াতেন।

ভুলু শেলীর নাম শুনেছে। কবিতা সে পড়ে নি। ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের কবিতা সে পড়েছে—লুসী গ্রে। লুসী অদ্ভুত নাম। হেনার মত হয়ত দেখতে ছিল কিংবা প্রজাপতির দেশের গৌরীর মত। আশ্বিনের ভোরে তকতকে আঙিনায় অজস্র শেফালীর মত হেনা। শেলীর কবিতার মত সে। অনেকগুলো ঝকঝকে চরণ। পদ্ম-পাপড়ির মত হেনার মুখ। কিন্তু সেখানে যেন আজ শ্যাওলা পড়েছে। অসুখ হয়েছে হেনার—অসুখ সারছে না। কবে সারবে?

করে পর্যন্ত! ওর মনটাও জ্যাঠামশাইয়ের পাগল মনের মত অস্পষ্ট উচ্চারণ করল, ঈশ্বর! হেনার অসুখ তুমি সারিয়ে দাও।

নীচে শঙ্খিনী ফুঁসছে আগের মত। এই মুহূর্তে ওর আবার ইচ্ছে হচ্ছে সাপটাকে ছেড়ে দিতে। সাপটাকে চাঁইয়ের ভিতর বন্দী রেখে কি লাভ। কি দরকার অন্য জগতের জীবকে তার জগতে ধরে রাখার। কিন্তু নারাণের রাগ ভয়ানক। সাপটাকে ছেড়ে দিলে মারামারি শুরু করে দেবে নৌকায়।

ফের দামোদরদীর হাট দেখা যাচ্ছে। অনেক লোক, লোকজনের ভিড়। অনেক নৌকা, নৌকার ভিড়। হাটের চারিদিকে ছোট-বড় নৌকায় অজস্র মানুষ। হাটের সরগম শোনা যাচ্ছে। কাঁঠালের নৌকায় হয়ত এখন আর কাঁঠাল নেই। তালের নৌকায় তাল শেষ। আনারসের নৌকায় কেরামতালী শেখ খুব জোর বিক্রি চালাচ্ছে নিশ্চয়ই।

ওদের ছোট নৌকাটা উজান টেনে আর এগোতে পারছে না। অন্যান্য নৌকাগুলো সব ওপরে উঠে গেছে। পিছনের যাত্রী-নৌকাগুলো ছুঁই-ছুঁই করছে ওদের। ওরা অনেক দূর যাবে। পাটাতনে ওরা রান্না চড়িয়েছে।

জল আর জল। জ্যৈষ্ঠ থেকে অঘ্রাণ মাস পর্যন্ত এ-পৃথিবীটা জলের নীচে ডুবে থাকে। তখন মনে হয় এটা শাপলা-শালুকের দেশ। অথবা মনে হয় বালিহাঁস আর জলপায়রার আকাশ। এই সময় জল-ঝড়ে বড়বৌর ছোটবৌর নদী ভেঙে বাপের বাড়ি যাবার ভীষণ শখ। তখন কলমীলতার বন, হেলেঞ্চার ঝোপ, জোনাকির কান্না সব, অন্য আর-এক পৃথিবী। আকাশে এ-সময় মেঘ জমে জল ঝরে। আবার নীল আকাশ—নক্ষত্রের আকাশে কুয়াশা ঝরে। শাপলা ফুলেরা রাতে শিশিরের জলে ভিজে অন্য-রূপে অপরূপ হয়। স্থলপদ্মেরা ভোর হবার আশায় রাত্রির প্রহর গোনে। উত্তর থেকে তখন টিয়াপাখির দল কামরাঙ্গা খেতে আসে। গাংশালিখেরা দল বেঁধে ফড়িংয়ের মত বাতাসে দোল খায়। ভুলুর ভাবতে ভাল লাগল এ-

পৃথিবীরই মানুষ সে। এবং মনে হল এই মুহূর্তে এ-সোনার দেশ ছেড়ে উত্তর থেকে উত্তরে কিংবা দক্ষিণ থেকে দক্ষিণে হারিয়ে যেতে ভাল লাগবে সে শুধু অন্য এক বেদনার জন্য—অন্য এক আকাশ থেকে তার আকাশকে উপলব্ধি করার জন্য।

ওরা তিনমাইলের উজান দিচ্ছে। তিনমাইলের ভাটি দেবে। ভাটি দেবার সময় ওরা অন্য কোনো চিন্তা করবে না, অন্য কথা ভাববে না। অন্য মুখ দেখবে না, অন্তত দেখবার চেষ্টা করবে না। জলের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে থাকবে। চল্লিশ থেকে আশি হাত নীচের মাছটা দেখার যেন চেষ্টা করবে। কথা বলবে না তারা। যদিও বলে, কথাগুলো ছোট ছোট হবে। দুটো-একটা কথা। দুটো-একটা [illegible]—[illegible]. [illegible]ই ওরা নিজেদের ভিতর সব বুঝে নেবে।

হা[illegible]ণ দাঁড় টানতে টান[illegible] একবারের জন্য দাঁড়টা জলের ওপর তুলে কিছুক্ষণ চুপ হয়ে বসল। দুহাতের শক্ত পেশীগুলো দেখল—খুব শক্ত নয় ওরা। অবশ্য দিন দিন শক্ত হয়ে উঠছে। বুক থেকে পেট পর্যন্ত সে লক্ষ্য করল। পেটের ক্ষিধের কথাটা ভেবে মনের ভিতর সে যন্ত্রণা পাচ্ছে।—হাটে নৌকা ভিড়াব নারাণ। চিঁড়ে-গুড় কিনতে হবে, তা না হলে আর উজান দিতে পারব না।

দূর থেকেই ওরা হাটের সরগরম শুনতে পেয়েছিল। প্রথম সরগরমটা চাপা গুঞ্জনের মত, পরে হাঁড়ির ঢাকনা উদা[illegible] করার মত। কানে তালা লাগিয়ে দিচ্ছে শব্দটা—কান পাতা যাচ্ছে না। ওরা নৌকা চালাল হাটের দক্ষিণ দিকে। ওরা অনেকগুলো মুলিবাঁশের ভেড়ী অতিক্রম করল। মঠের নীচে এসে দুহাতে দুদিকের নৌ[illegible] সরিয়ে ফাঁক-ফোকরে ঢুকে গেল। তবু মাটিতে ওরা লগি পুঁত[illegible] পারল না। শ দুই নৌকা এখনও সামনে রয়েছে। নৌকাগুলো কাঠে কাঠে লেগে আছে। অন্য নৌকার গুড়ার সঙ্গে তাই তারা দড়ি বাঁধল। ভুলু আর নারাণ চিঁড়ে-গুড় কেনার জন্য নৌকার পর নৌকা লাফিয়ে লাফিয়ে পার হল। মঠ পার হল তারা। গেণ্ডারীর হাট পার হয়ে আনাজের হাটে পড়ল তারা। জলকচু-করলা-পটল-ঝিঙের

পাহাড় এখানে। দামদস্তুর, চাপা ঝগড়া সবই হচ্ছে। অদ্ভুত গন্ধ পেল ওরা। জিলিপি-ভাজা তেলের গন্ধ। এ-গন্ধ নারাণ ভুলু দুজনেরই ভাল লাগল।

একটা সাধু—গলায় মালা, কপালে রক্ত-চন্দনের আঁচড়। রক্তবাস পরনে। সাধু উর্ধ্ববাহু হয়ে চলেছেন। হাতে চিমটা। বম-বম করে গাল বাজাচ্ছেন মাঝে মাঝে। সাধু দেখে ভুলুর কেমন ভয় ধরল।—এই নারাণ, ওদিকটায় চল। দেখছিস না, সাধুটা কেমন টগবগ করে চেয়ে আছে! ওর মনে হল তখন—সেই ডালিমকুমার, সেই সাধু, সেই কাপালিককে, যে-কাপালিক ডালিমকুমারকে পাতাল-তে নিয়ে গিয়ে মায়ের মন্দিরে বলি দিতে চেয়েছিল। নরবলি—একশজন রাজপুত্রের মুণ্ডু মাকে দিয়েছে। আর এ[illegible]একশ এক। সাধুর সিদ্ধি! ভাগ্যিস ডালিম[illegible]র বলেছিল, রাজ[illegible]ছেলে আমি, প্রণাম জানি না।—এই নারাণ, নারাণ, এদিকটায় নয়, অন্যদিকে চল। নারাণকে টানতে টানতে ভুলু হাটের অন্যদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এখানে অনেক জিলিপির দোকান। জিলিপির দোকানগুলো দেখে ভুলু বুঝতে পারল এটা রমজান মাস। দোকানীরা জিলিপির পাহাড় দিচ্ছে। সন্ধ্যার পর একটা জিলিপিও পড়ে থাকবে না। এই নারাণ, একপো জিলিপি কিনবি?

নারাণ একপো জিলিপি কিনল। চিঁড়ে কিনল একপো। সব হাট ওরা ঘুরতে পারল না। এত বড় হাট ঘুরতে গেলে পরের ভাটায় '[illegible]' ছাড়া যাবে না। ওরা সেজন্য তাড়াতাড়ি নৌকায় ফিরল।

[illegible]ঠের কাছে এসে একবার দরজায় কান পাতল নারাণ। অনেকক্ষণ কান পেতে মঠের নীচ থেকে কোনো শব্দ উঠে আসছে কিনা লক্ষ্য করল। ভুলু সামনের নৌকায় উঠে ডাকল তখন, কিরে, ওখানটায় কি করছিস? তাড়াতাড়ি আয়।

—তুই যা, আমি যাচ্ছি একটু পরে। নারাণ মঠের চারদিকে ঘুরতে থাকল। মঠের দরজাটা ঠেলে ঠেলে দেখল খুলতে পারে

কিনা। সে গল্প শুনেছে হাতি দিয়ে নাকি দরজাটা খোলার চেষ্টা করা হয়েছিল, হাতি নাজেহাল হয়েছে, কিন্তু খুলতে পারে নি। দরজার ওপর কিছু লেখা রয়েছে, যে পড়তে পারবে তার জন্যই শুধু দরজা খুলবে। সে অনেকক্ষণ ধরে লেখাগুলো পড়ার চেষ্টা করল। কিছুই বুঝল না এবং পড়তেও পারল না সে। ওর ইচ্ছা লেখাগুলো ওর চোখের ওপর বাংলা হরফের মত করে দেখা দিক। মৌলভী সাহেবরা বলেন, ওটা আরবী লেখা। আরবী লেখা ত সোবানআল্লা করে পড়ে ফেলুন। দরজাটা খুলুক আর আপনারা তর তর করে সিঁড়ি ধরে নীচে সেই দীঘিটায় নেমে যান ; দীঘির ইলিশ মাছগুলো ধরে মাছের রাজা বনে যান। নারাণের চোখদুটো দেখলে বোঝা যাবে সে এখন ক্ষেপে গেছে, এবং রীতিমত ছটফট করছে।

নারাণ এদিক-ওদিক চেয়ে মঠের সিঁড়ি ধরে পাশের নৌকায় নেমে গেল। আরো নৌকা অতিক্রম করে নিজের কোষায় এসে পা রাখল। হারাণ ভুলু চিঁড়ে-জিলিপি খাচ্ছে। সেও ওদের সঙ্গে খেতে বসে পড়ল। দে দুটো খাই। জিলিপি সব শেষ করে দিস নি ত!

—এই দেখ না তোর ভাগেরটা রেখেই আমরা খাচ্ছি।—হারাণ ওর কলাইকরা থালাটা বের করে দিয়ে খক খক করল। শুকনো চিঁড়ে ওর গলায় আটকে গেছে।

ভুলু বলল, জল খা। জল খেলে কাশি কমবে।

হারাণ জল খেয়ে বলল, ভগবান করুন আমরা এ-ভাটিতে যেন চাঁইন মাছ পাই। খুব বড় চাঁইন। চাঁইন মাছের পেটি—আঃহ! হারাণ জিভে টাস টাস শব্দ করল। চাঁইন মাছ মা যা রান্না করে! নারাণ ভুলু, তোরা যাবি আমার বাড়ি।

নারাণ মুখ নুয়ে একটু কটাক্ষ করল।—টুসটুসীর বাচ্চা, ভাগ বেশী পাবার জন্য কতরকমের কথা বলছে!

হারাণ রাগ করল।—হ্যাঁ, আমাকে সব সময় তোরা বেশী দিয়েই বসে থাকিস! একদিন দিস ত, দশদিন খোঁটা দিস।

—কবে তোকে খোঁটা দিয়েছি। এই চোর, এই টুসটুসীর বাচ্চা। কোন্‌দিন তুই বেশী না নিয়েছিস! বেশী করে সব সময় নেবেন, সত্যি কথা বললে ওনার যত রাগ! মুখ ভার করবেন।

—নারাণ, চোর বলবি না। কার ঘরে আমি সিঁধ দিতে গেছি?

—ওঃ কি আমার নবাবের বাচ্চারে! চোর বললে রাগ হবে ওনার। চোরকে চোর বলব বেশী কি! তুই চোর, টুসটুসী চোর!

—শুয়োর! তুই আমার মাকে চোর বলবি! হারাণ নারাণের মাথার ওপর বৈঠা তুলল।—মেরে ফেলব তোকে! হারাণের চোখ দুটো শঙ্খিনী সাপের মত ফুঁসছে।

হাতের কাছে নারাণ বৈঠা পেল না। পাটাতনের নীচে চাঁইটা রয়েছে, চাঁইটা সে নীচ থেকে টেনে তুলল। তারপর চাঁইয়ের মুখটা খুলতে খুলতে বলল, দেব সাপটা তোর ওপর ছেড়ে! চোর কোথাকার! চোরকে চোর বলব তাতে আবার রাগ! খুনখারাপি করবেন তিনি। কর এবার খুনখারাপি, বলে চাঁইয়ের ভিতর থেকে সাপটা টেনে বের করতে গেল।

হারাণ খুব অসহায় বোধ করতে থাকল। ভুলু হাতের খাবারটা অন্য দিকে সরিয়ে বলল, নারাণ কাজটা খুব ভাল হচ্ছে না। সাপটা চাঁই থেকে ছুটে গেলে হারাণকে ছোবল না মেরে তোকেও মারতে পারে। কাকে মারবে ঠিক আছে!

অন্যান্য নৌকা থেকে মাঝি-মাল্লারা হৈ হৈ করে উঠল। নারাণ দেখল কেউ কেউ এদিকেই ছুটে আসছে। ওরা হয়ত পাটাতনে উঠে চাঁইটা জলে ফেলে দেবে। তাড়াতাড়ি সে চাঁইটা পাটাতনের নীচে ঢুকিয়ে নৌকার দড়ি খুলে দিল। স্রোতের মুখে নৌকা ছেড়ে প্রাণ খুলে হাসতে থাকল সে। শঙ্খিনী দেখে মানুষগুলোর পিলে চমকে গেছে এ-কথাও ভাবল। হালে বসল নিশ্চিন্ত মনে, শেষে গান ধরল, ও আকাশ, ও তারা, ভয়-ভরা জীবন রে, মনের মত মানুষ আমার কোথায় গেলে মিলবে রে···

মানুষগুলোকে সে পুঁটিমাছের মত করে ভাবল। মনে হল মানুষগুলো শাপলা ফুলের মত। একটা শঙ্খিনী দেখে এতগুলো মানুষ হৈ হৈ করছে ভাবতেই ওর আবার হাসি পেল। এখন মঠের নীচের দীঘিটার কথা তার মনে বারবার উঁকি দিচ্ছে। মঠ থেকে একটা সিঁড়ি দীঘিতে গিয়ে মিশেছে। এ-গাঙে ইলিশের অভাব। বর্ষাকালে সব ইলিশ মঠের নীচের সেই দীঘিতে গিয়ে পালিয়ে থাকে। নদীর সঙ্গে দীঘির একটা সরু পথ আছে। সে-পথে মাছগুলো যাতায়াত করে। নারাণ দামোদরদীর মঠের দিকে চেয়ে গলার স্বরটা আরো উঁচু করে দিল ঃ ডেঙ্গুরে-জ্যাঠা বলেছে মেঘনার প্রকাণ্ড চাঁইন মাছটাও সেই দীঘিতেই থাকে। সে মাছটাকে অনেকে দেখেছে, মাছটার মুখে আগুন জ্বলে। রাত্রিবেলা মাঝে মাঝে মাছটা নদীর ওপর ভেসে জোনাকি খায়। নারাণের ইচ্ছা সেই মাছটা ওর বঁড়শিতে এসে ধরা দিক। সে বঁড়শি ছুঁড়ল। বঁড়শিগুলো গড় গড় করে নোঙরের মত নামছে। গেরাফী ফেলবে চাঁইন মাছের মুখে। মাছটা গেরাফী মুখে নিয়ে ছুটবে আর ছুটবে। কখন তেমন একটা ঘটনা ঘটবে সেই আশায় ওরা জলের ওপর আবার নুয়ে পড়েছে। চোখে মুখে এখন ওদের প্রচণ্ড উত্তেজনা, বড় কোনো চাঁইন মাছ বঁড়শি টেনে নৌকাটা তল করে দিক।

কিছু কিছু নৌকা বারদীর মুখ থেকে ভাটি দেবার জন্য এখনও উজান বাইছে। যারা দামোদরদীর মুখ থেকে নৌকা ভাটায় ছাড়বে তারা সকলে চুপ। যেমন চুপ হয়ে গেছে নারাণ-হারাণ। ভুলু মাঝে মাঝে মুখ তুলে নদী দেখছে, নদীতে আরো সব নৌকা ভিড়তে দেখছে। নারাণগঞ্জ থেকে এ-সময় স্টিমার আসবে। নৌকাগুলো তাই মাঝগাঙ ছেড়ে দিয়ে কিনার ধরে ভাটি মারছে। সেও তার হালটাকে আরছা করে দিল।

প্রথম ওরা শুনল সনকান্দার হেকমতের নৌকায় চাঁইন আটকেছে, পরে শুনতে শুনতে ওরা পাগলের মত হয়ে গেল। ওরা চোখ তুলে দেখল প্রায় নৌকাতেই চাঁইন আটকে যাচ্ছে। যেন জোয়ার এসেছে

চাঁইন মাছের। মাছগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে যেন নৌকায় উঠল। নারাণ খুব বিমর্ষ হয়ে গেছে। নদীর ওপর হৈ-হল্লা, গল্প-গুজব। যারা মাছ ধরছে তারা বলছে, দশ সের, পনের সের, আধমণের মত মাছটা। ওরা বলছে, আমাদের একটা মাছ দাও ভগবান। আমরা ছোটমানুষ, আমাদের একটা মাছ দাও। ভুলু চোখ তুলে দেখল নদীর ওপর অনেকগুলো নৌকা এলোমেলো ছুটছে। ওরা বড় চাঁইন ধরেছে। চাঁইন মাছগুলো ওদের দক্ষিণ থেকে দক্ষিণে, অথবা পুব থেকে পুবে এলোমেলো ভাবে নিয়ে ছুটছে। অদ্ভুত লাগছে দেখতে এই নদী, এই নাও, এই মানুষ। সূর্যের রঙ জলে চিকচিক করছে। হাট-ফেরত মানুষগুলো চোখ তুলে দেখছে। ওদের চোখেও বিস্ময়। দশ সের পনের সের কথাগুলো ওরাও ভাবছে।

এইসব দেখে ভুলু মাছধরার কথা ভুলে গেল। তার কেন জানি মনে হল এই নদীর জলে অনেক কথা জমা হয়ে আছে। অনেক বেদনা আত্মগোপন করেছে। অনেকের দুঃখ মাছ ধরতে পারছে না। তারা নদীকেই নালিশ দিচ্ছে। ভুলুর কোনো নালিশ নেই এখন। সে দিগন্তের দিকে চেয়ে জলের রেখার বিস্তার দেখল; এ-জলের রেখা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে ভুলু সে খবর রাখে, কিন্তু কি ভাবে গিয়ে শেষ হয়েছে সে-খবর তার জানা নেই। কোন গ্রাম, কোন ঘাট, কোন কাশফুলের চর ডাইনে কিংবা বাঁয়ে ফেলে গেছে তার খবর সে ঠিক জানে না। তবু মনে হয় অতি-পরিচিত দু পারের চর, কাশফুল আর বালিয়াড়ি, পড়ন্ত রোদে নদীর ঘাট সব অতি পরিচিত। সে যদি কোনদিন চাঁইন মাছ খুঁজতে কেবল দক্ষিণ থেকে দক্ষিণে হারিয়ে যেতে থাকে—কাশফুল, বালিয়াড়ি, পড়ন্ত রোদে নদীর ঘাট এবং দু তীর ধরে যা দেখবে, মনে হবে এই মেঘনা, এই জল, এই নদী, এই দেশ। কোনো ফারাক নেই। নৌকায় নৌকায় তখন মাছ। ওর হৃদ্‌পিণ্ড কাঁপছে। নারাণ এখুনি চেপে ধরবে বঁড়শিটা। হারাণ হয়ত বলবে, জোরে টান, হালে বস ভুলু। আটকে গেছে, আটকে গেছে!

ওদের উৎসাহ এবং উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে। এ-একটা বিরাট জো যাচ্ছে! এই জোয়ে মাছ না পেলে নসিব যে কি মন্দ সে আর ভাবতে পারছে না তারা। ওদের মুখে কোনো কথা নেই সেজন্য। জলের ঘূর্ণির মত কথাগুলো মনের ভিতরেই পাক খাচ্ছে। ওরা কখন আটকে গেছে, আটকে গেছে বলে চিৎকার করতে পারবে সেই আশায় আছে। নদীর তীরে কি ঘটল অথবা কোন গাছের ডালে কোন পাখিটা ডাকল বিন্দুমাত্র তারা তা দেখতে পেল না, শুনতে পেল না। পাগল-জ্যাঠামশাইয়ের কথা একবার শুধু মনে হল ভুলুর। তিনি একবার নাকি বর্ষার মেঘনা সাঁতরে পার হয়েছিলেন। কি তাজ্জব কাণ্ড! বর্ষার মেঘনা সোমত্ত মেয়ের মত—ঈশা বলেছে।

ঈশা আরো সব বিচিত্র খবর দিয়েছে ভুলুকে, নারাণকে। দামো-দরদীর মঠ মাঝে মাঝে নড়ে উঠে। সেই দীঘিতে ইলিশ মাছ কিংবা চিতল মাছগুলো যখন একসঙ্গে লাফায় তখনই মঠটা নড়ে। ঈশা বলেছে, কান পেতে সন্তর্পণে শুনলে খলখল আওয়াজটা মঠের নীচে শোনা যায়। অবশ্য রাতে মধ্যরাতে। যখন এ পৃথিবীটা ঘুমিয়ে থাকে এবং একমাত্র মঠটা জেগে থাকে।

ভুলু জানে এই বিশ্বে এই খবরটুকু আর কটা লোক রাখে! অথচ এই খবর যে কত বিস্ময়ের! আকাশের এরোপ্লেন দেখে সে বিস্মিত হয়েছে, কিন্তু রাতে লণ্ঠন জ্বেলে তামাক টানতে টানতে ঈশা যখন দামোদরদীর মঠের গল্প করে, মাছধরার গল্প করে তখন মনে হয় যারা এ বিস্ময়ের এবং আশ্চর্য জগতের খবরটুকু রাখল না তাদের মন্দ কপাল। মাছের গল্প করার সময় ঠাকুরঘরের পিছনে জোনাকি জ্বলত, বেতের ঝোপের নীচে শোল, গজাল মাছ ভেসে থাকত, অন্ধকার রাতে টুপ টুপ করে জলের ওপর লাফিয়ে মাছেরা জোনাকি খেত—সে সময় ঈশা পুকুরে মাছের চারি শুনে বলত, যে গজাল মাছটার কপালে সিঁদুরের ফোঁটা আছে, ওটা মাছের রাজা। যে ওকে ধরবে সে আর বাঁচবে না। বড় পুরনো দীঘিতে ওরা থাকে। থামের মত ভাসবে,

থামের মত ডুববে। মনে হয় অতিকায় একটা অজগর জলের ওপর ভাসল; জলের ওপর ডুবল।—কি সব কথা বলে ঈদা!

ভুলু ভাবল ঈদা নৌকায় থাকলে এতক্ষণে একটা মাছ তুলে ফেলতে পারত। ডেঙ্গুরে-জ্যাঠা থাকলেও পারত। মাছের নাড়ী-লক্ষণ ওর চেনা। ঈদা হয়ত জলের নীচের মাটি দেখতে পায়। মাছগুলো দেখতে পায়। কোন মাছটা কোন পথ ধরে যাবে হদিশ করতে পারবে সে।

হারাণ চেপে ধরল বঁড়শিটা—আরো, আরো জোরে চেপে ধরল। মুখটা ওর জলের সঙ্গে ছুঁয়ে গেছে। নৌকাটা কাত হতে শুরু করেছে। নারাণ তখন দু হাত ওপরে তুলে চিৎকার করল, টাঁইন আটকে গেছে, টাঁইন! নদীর ওপর কথাটা প্রতিধ্বনি তুলল—টাঁইন! টাঁইন!! ভুলু উপুড় হয়ে দেখল বঁড়শির সুতো জলের নীচ থেকে মাছটা শক্ত করে টেনে ধরেছে। হারাণ প্রাণপণে টেনে সুতো-টাকে এতটকু ঢিল করতে পারছে না। চোখে-মুখে ওর উত্তেজনা। —হালে বস ভুলু, মাছটা মাটিতে গোত্তা খেয়েছে! মুখের গেরাফিটা মাটিতে ঘষছে। শক্ত করে বৈঠা ধর।

হালে বসে শক্ত করেই বৈঠা ধরল ভুলু। বুকটা আনন্দে এবং উত্তেজনায় কাঁপছে। নারাণ নিজের বঁড়শিটা ততক্ষণে জলের ওপর তুলে ফেলছে। পাটাতনে গোল গোল করে প্যাঁচ দিয়ে রাখল বঁড়শির সুতোটা। সে আনন্দে হারাণকে জড়িয়ে ধরল।

স্রোতের টানে নৌকা থরথর করে কাঁপছে, কিন্তু নড়ছে না। একটা দিক ক্রমশ তল হয়ে যাচ্ছে নৌকার। হারাণকে এবার বিষণ্ন মনে হল।—কিরে মাছটা মাটিতে সেই যে গোত্তা খেল আর তো উঠছে না। বঁড়শির সুতোটা গুণের মত শক্ত হয়ে গেল।

—টান, টান, জোরে টান! নারাণ বঁড়শির ওপর ঝুঁকে পড়ল।

—না উঠে আসছে না। নৌকার সামনের দিকটা ক্রমশ তল হয়ে যাচ্ছে। বঁড়শিটা নৌকাটাকে ক্রমশ তল করে দিচ্ছে। হারাণ চিৎকার করে উঠল—কি হবে, কি হবে ন'রাণ!

প্রায় আশি হাত জলের নীচে মাছটা কি ভাবে আছে, তারা তা বুঝতে পারল না। মাছের রাজা বঁড়শিতে আটকে যায় নি ত! চাঁইন মাছের রাজা; কপালে সিঁদুরের ফোঁটা নেই ত! কিন্তু মাছটা কি ঠিক করেছে নৌকাটা ডুবিয়ে দিয়ে নদীর ওপর ভেসে উঠবে? কিংবা নৌকার নীচে এসে খোলটাকে ফাটিয়ে দিয়ে তারপর পাগলের মত দক্ষিণ থেকে দক্ষিণে অথবা পূব থেকে পূবে ছুটবে। কি হবে তবে! ঈদার মুখে গল্প শুনেছে চাঁইন মাছের রাজারা তিন থেকে চার মণ পর্যন্ত হয়। মাছটা ইচ্ছা করলে অনায়াসে তাদের ছোট নৌকাটাকে ডুবিয়ে দিতে পারবে। ভুলু ভাবল, এত বড় মাছ ত তারা চায় নি। আরো ছোট, ছোট হলে কি তেমন ক্ষতি ছিল!

অন্যান্য নৌকাগুলো ক্রমশ স্রোতের টানে নীচে গিয়ে নামছে। শুধু ওদের নৌকাটা একবিন্দু নড়ল না। কালো জল—পাশে, জলের নীচ থেকে ঘূর্ণি উঠে আসছে। এতক্ষণে ওরা তিনজনই ওটা লক্ষ্য করল। পাতাল থেকে যেন কোন নাগিনী-কন্যা ফুসছে। অথবা মাছটা মুখের গেরাফি মাটিতে ঘষছে। কারণ, জলের ঘূর্ণিতে নীচের বালি ওপরে উঠে চিকচিক করছে। এমন ঘূর্ণিতে নৌকা পড়লে এক টানে নৌকা নীচে নেমে যাবে। নৌকা ডুববে, ওরা তিনজনে ডুববে। সাঁতার কেটে পারে উঠবার ক্ষমতা থাকবে না তখন।

॥ তিন ॥

ওরা তিনজন একসঙ্গে অসহায় বোধ করতে থাকল। পাশে, পূব পশ্চিমে কোনো নৌকা নেই। ওদের আনন্দের উত্তেজনাও আর নেই। ওরা ভয় পেতে আরম্ভ করেছে। হারাণ বলল—বঁড়শি ছেড়ে দি।

—খবরদার!—নারাণ চিৎকার করে উঠল।—মাছটা না তুলে কিছুতেই এখান থেকে নড়ব না।

ভয়ে হারাণের চোখ শূন্যদৃষ্টি হয়ে গেছে। সে কাঁপতে কাঁপতে বলল, দেখছিস না নৌকাটাকে আস্তে আস্তে ডুবিয়ে দিচ্ছে। আমরা যে সব ডুবে মরব।

ভুলু হাল থেকেই বলল—নারাণ, দরকার নেই মাছের রাজাকে ধরে। ঈদা বলেছে, মাছের রাজাকে যারা ধরে, তারা বাঁচে না।

নারাণ কোনো জবাব দিল না।

ওরা সকলে চুপচাপ বসে থাকল। মৃত্যুর জন্য যেন অপেক্ষা করল। কালো জল, অথৈ জল। জলের ভিতর হয়ত কত রকমের জীব ঘোরাফেরা করছে। কত রকমের প্রাণী খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে। হারাণ জলের ঘূর্ণি দেখে আড়ষ্ট বোধ করতে থাকল। মনে হল ওর, এক্ষুনি সেখানে একটা সরীসৃপ ভেসে উঠবে, সে ভয়ে শক্ত হয়ে বসে থাকল।

নারাণ ভাবছিল জলের নীচ থেকে অতিকায় মাছটা এক্ষুনি ভেসে উঠবে—জলহস্তীর মত কিংবা শুশুক মাছের মত। তারপর গুন-টানার মত টানবে নৌকাটা। মেঘনার এক তীর থেকে অন্য তীরে, এক চর থেকে অন্য চরে, এক জলা থেকে অন্য জলায় নিয়ে যাবে। সে শুধু এই ঘটনার জন্য অপেক্ষা করছে। মাছটা গোত্তা খেয়ে যখন জলের নীচে একবার পড়েছে তখন আর একবার ভোঁস করে জলের ওপরে ভাসবেই।

ভুলু ভাবল অন্যকথা। ...মাছটার একটা জগৎ আছে। সেখানে মাছটার দুঃখে অন্য মাছগুলো হয়ত কাঁদছে। মাছগুলো হয়ত বিদ্রোহ করবার জন্য জলের নীচে শলা-পরামর্শ করছে। আর সে সহসা দেখতে পেল মেঘনার বুকে যেন লক্ষ ঢাইন মাছ শুঁড় উঁচিয়ে ওদের তিনজনকে তেড়ে আসছে। যেন, ওদের নালিশ—আমাদের জগতে আমরা আছি, তোমাদের জগতে তোমরা থাক। আমাদের যন্ত্রণা দিলে তোমাদেরও যন্ত্রণা সইতে হবে। তারপর সে দেখল মাছগুলো ওদের ডিঙিটাকে ভেঙ্গে খানখান করে দিয়েছে। ওরা জলের ওপর ভাসছে, ঘূর্ণিতে পড়ে জল খাচ্ছে, আর মাছগুলো বগলে শুঁড় দিয়ে সুড়সুড়ি দিয়ে ওদের হাসাচ্ছে। যেন হাসাতে হাসাতে মেরে ফেলবে ওদের। ভুলু চোখ বুজে আরো কি সব ভাবল কি সব মনে হল। শেষে চোখ খুলে সব ভুলে থাকবার চেষ্টা করল।

এমন সময় ওরা দেখল অন্যান্য নৌকাগুলো উজান মেরে বৈদ্যের বাজার থেকে ফিরছে। কেউ কেউ এ-তীর ঘেঁষে আসছে। নৌকাগুলো কাছে আসতেই হারাণ চিৎকার করে বলে উঠল,—আপনারা তাড়াতাড়ি আসেন। মাছটা সেই যে মাটিতে গোত্তা খেয়েছে—আর উঠছে না।

এক এক করে অনেকগুলো নৌকা কাছে এল। একজন বুড়োমানুষ ওদের নৌকায় উঠে বঁড়শির সুতোটা দুবার টেনে বলল, গিঁট খুলে দাও, বঁড়শিতে মাছ আটকায় নি।

নারাণ চোখদুটো বড় বড় করে বললে—কি বলছেন, চাচা!

—বঁড়শি তোমাদের কোনো গাছে-টাছে কিংবা পাথর পাঁচিলে আটকে গেছে। গুড়ার গিঁট খুলে দাও।

হারাণ খুব বিমর্ষভাবে গুড়ার গিঁট খুলতে থাকল। বুড়োমানুষটা ভুলুকে বলল, বাবু সাবধান! ভালো করে হাল ধরেন। গিঁট খুলে দিলে নৌকাটা বোঁ করে ঘুরে যাবে কিন্তু। ডিঙি ডোববার ভয় আছে।

হারাণ গিঁট খুলতে পারছিল না বলে নারাণ দা দিয়ে বঁড়শির সুতো কেটে দিল। সঙ্গে সঙ্গে নৌকাটা দুবার ঘুরে গেল। তারপর স্রোতের মুখে সবেগে ছুটে চলল।

নারাণ বসল দাঁড়ে। হারাণ বসল দাঁড়ে। ওরা কেউ কোনো কথা বলল না। সকলে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আজ আর ফিরতি-ভাটি দেবার ক্ষমতা ওদের নেই। এখন গিয়ে দামোদরদীর ঘাটে নৌকা বেঁধে শুয়ে পড়বে। বুড়োমানুষটাকে অন্য নৌকায় নামিয়ে দেবে তারা।

দুপুর শেষ হয়ে গেল অথচ বিকেল তখনও ঠিক হয় নি। দুপুর বিকেলের ফাঁকটুকুতে ওরা তিনজন এসেছে হাট সেরে দূরে গ্রামের পাশাপাশি প্রকাণ্ড একটা পিটকিলাগাছের ছায়ায়। ওরা ক্লান্ত, ওরা বিষণ্ণ। হাতের পেশীগুলোতে টান ধরেছে। ওরা একটা ডালে নৌকা বেঁধে শুয়ে পড়ল। প্রবল উত্তেজনার পর পরম প্রশান্তি। পড়ন্ত বিকেলে ঘুঘুপাখির ডাক শুনতে শুনতে ওরা তিনজন ঘুমিয়ে পড়ল।

এখন এই নির্জন পৃথিবীতে ওরা তিনজন, আর একটি জলের রেখা বিশেষ অস্তিত্ব নিয়ে জেগে আছে। দূরে সড়ক ধরে হাট-ফেরত লোক লগি বেয়ে ঘরে ফিরছে। হাট-ফেরত মানুষগুলো সে অস্তিত্বের কথা বুঝতে পারল না। ওরা অন্য কথা বুঝল। ওদের তিনজনের কথা ওরা অন্যভাবে ভাবল। তখন ইষ্টিকুটুম পাখিটা নদীর পার থেকে উড়ে এসে গাছটায় বসল। তারপর ওদের তিনজনকে দেখেই যেন ডাকল—ইষ্টি—কু—টুম। সে যেন ওদের তিনজনকে ওর নিজের দেশের কুটুম বলে ভাবল।

এখানে একখণ্ড পৃথিবী, অথচ কি এক বিস্ময়! অনেক পাখি এখানে ডাকছে। গ্রামের এই নির্জন প্রান্তে পাখিরা অন্য এক বিস্ময়ে তন্ময়। ওরা আকাশ থেকে জলে, জল থেকে আকাশে, গাছের ছায়ায় উড়ে বেড়াচ্ছে। ওদের তিনজনকে সব পাখিরাই ঘুরে ফিরে যেন

দেখল। ইষ্টিকুটুম পাখিটা এখনও ডাকছে। কিন্তু ওরা ত জাগল না, ঘুম আর ঘুম। শাপলাপাতায় একটা পাখি বসল। পাতাটা ডুবে গেছে। জল উঠেছে পাতার ওপর। বিন্দু বিন্দু ঘামের মত, অথবা ইষ্টিকুটুম পাখির চোখের মত বিন্দু বিন্দু জলগুলো শাপলাপাতার ওপর কাঁপছে। একটা টুনটুনি উড়ল। পাখিটা ছোট। খুব ছোট। জলের ওপর ছায়াটা বিন্দুবৎ হয়ে ভাসছে। টুনিফুলের গুচ্ছগুলো জলের নীচে ঢুলছে। টুনটুনি পাখিটা টুনিফুলের অন্ধকারে এবার হারিয়ে গেল।

একটা খুট খুট শব্দে ভুলু জাগল। সে চোখ মেলে দেখল গলুইয়ের কাঠে শালিক পাখি। ধানক্ষেত থেকে পাখিটা গাঙফড়িং ধরে এনেছে ঠোঁটের ভিতর ফড়িংটা মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করছে। মাঝে মাঝে ফড়িংটাকে গলুইয়ের কাঠে বাড়ি মারছে। খুটখুট শব্দটি সেইজন্য সে সন্তর্পণে উঠে বসল। শালিকটা উড়ে গেল। উড়বার আগে ঠোঁট থেকে ফড়িংটা খসে পড়েছে। সে ফড়িংটাকে হাতে তুলে দেখল— বাঁচবে? বাঁচবে না। তবু ফুঁ দিল মাথায়, যেমন সে একটি কাকের বাচ্চাকে মাথায় ফুঁ দিয়ে ভালো করে দিয়েছিল, তেমনি ফড়িংটাকে ভালো করবার চেষ্টা করল।

ফড়িংটা এতক্ষণে মরে গেছে। সে ফেলে দিল হাত ধুয়ে নিয়ে ইষ্টিকুটুম পাখিটা দেখল। অনেকগুলো কাক উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। একটা বাজপাখি অনবরত আকাশের নীচে উড়ছে। এক দল গাংশালিক কিচমিচ করতে করতে ধানক্ষেতের ভিতর গিয়ে বসে পড়ল। দুটো ডাহুক পাখি আগে আগে এক ঝোপ থেকে অন্য ঝোপে যাচ্ছে। ডাহুকের বাচ্চাগুলো ওদের অনুসরণ করছে।

এখান থেকে হাট অস্পষ্ট। অনেকগুলো ঝোপঝাড় অতিক্রম করে হাট। তবু ভুলু বুঝতে পারল হাটটা ক্রমশ পাতলা হয়ে আসছে। সূর্য ডুবো ডুবো। ইতস্তত এদিক ওদিক অনেক নৌকা। কোষা, ডিঙি, বাইচ, একমাল্লা, দোমাল্লা। নৌকাগুলোর পাটাতনে রমজান মাসের নামাজ হচ্ছে। নামাজ শেষে ওরা জিলিপি কিনবে, মশলায় ভাজা

ছোলা কিনবে। তারপর আল্লা আল্লা করে দড়ি খুলে দেবে লগি থেকে। অন্ধকারে নৌকা চলবে, লণ্ঠন জ্বলবে পাটাতনে। গালগল্প হবে গ্রামের। ছোটবিবির বড়বিবির কথা হবে। নতুন গামছা আর নতুন লুঙ্গি কেনার খবর দেবে বড়বিবি ছোটবিবিকে।

নারাণ হারাণ ঘুমুচ্ছে এখনও। সাপের ফোঁস ফোঁস শব্দ শোনা যাচ্ছে না। চাঁইয়ের ভিতর সাপটা ঘুমোল বুঝি। ভুলু চুপচাপ গলুইয়ের ওপর বসে থাকল। জলের ওপর গাঙফড়িংদের দেখল। দুটো ছোট মাছ জলের ওপর উঠে দুটো ফুটকুড়ি ছাড়ল। জলটা খুব পরিষ্কার। জলের নীচে শ্যাওলাগুলো সবুজ কদমফুলের মত দেখতে। স্রোতের মুখে শ্যাওলাগুলো কাঁপছে। লাল নীল শাড়ি-পরা বইচা মাছগুলো লুকোচুরি খেলছে সেই শ্যাওলার নীচে, কোনো ভয়-ডর নেই। অন্য একটা শ্যাওলা খুব নড়ে নড়ে থেমে গেল। শোলমাছের বাচ্চাটা এদিকেই আসছে। বইচা মাছগুলো ভয়ে তিড়িং করে অন্যদিকে পালিয়ে গেল। শিকারী শোলমাছের বাচ্চাটা গোত্তা খেয়ে তবু একটা বইচা মাছকে ধরে ফেলেছে। ওটা মুখে নিয়ে লেজ নাড়তে নাড়তে পাশের খালটাতে নেমে গেল। ভুলু মুখ তুলে এবার অন্যদিকে চাইল।

ভুলুর অন্য কথা মনে হল। অন্য নৌকার কথা মনে হল! সে নৌকায় যমুনা-পিসি থাকতেন। মা, দাদু থাকতেন. একদিন একরাত নৌকায় কাটাত—শাঁমগা যেতেন দাদু। মার মামারবাড়ি সেখানে। ভুলু থাকত সে নৌকায়। একবার হেনাও গিয়েছিল। বাড়ির আরও ছেলেপুলে থাকত। পাগল-জ্যাঠামশাই যেতে চাইতেন। কিন্তু পাগল মানুষ বলেই তাঁকে নেওয়া হত না। বাঁশঝাড়ের নীচে কুয়োতলার ঘাটে তিনি এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতেন নৌকা ছাড়বার সময়। মা ঘোমটা টেনে, গলুইতে জল দিয়ে, মাথায় জল ছুঁইয়ে ছইয়ের ভিতর ঢুকে যেতেন। জ্যাঠামশাই ঘাট থেকে নড়তেন না। অন্য কেউ এসে জ্যাঠামশাইয়ের হাত ধরে বাড়ির ভিতর টেনে নিয়ে যেত। তখন মনে হত না জ্যাঠামশাই, এমন সুপুরুষ মানুষটি পাগল।

এখানে এই নৌকায় যেমন সে চুপি দিয়ে জলের নাচে শ্যাওলা-গুলো দেখছিল, সেখানেও তেমনি জলের ওপর চুপি দিয়ে জলের নীচের শ্যাওলা দেখত সে। নৌকার মাঝি-মাল্লারা যেখানে বসে হুঁকো সাজত সেখানে বসে জলের ওপর চুপি দিয়ে থাকত। মা ঘোমটার ভিতর থেকে, আঃ কি করছিস, জলে উল্টে পড়বি যে।—বলে ফিসফিস করে কথা বলতেন। নৌকার সকলে সে-কথা শুনতে পেত। অথচ মা কেন যে দাদুর আর বাবার সামনে এমন করে কথা বলে সে তখন বুঝতে পারত না। যমুনা-পিসি ডাকতেন, আয় রে ভোলা, দাদু-ভাই ত আমার লক্ষ্মী। লক্ষ্মী ভাইটি ছইয়ের নীচে এসে বোস। হাত ধরে মা টানতেন, বাবা ধমক দিতেন, মাঝি-মাল্লারা রসিকতা করত। দাদুর দেশের লোক তারা। দাদুর স[illegible]ও ভুলুর সঙ্গে রসিকতা করে সোহাগ দেখাত।

বাড়ি থেকে গোপালদী পর্যন্ত কোনো নদী পড়ত না! ছোটো একটা খাল পড়ত—বড় বড় বিল পড়ত অনেক। কাটা পাটের জমি পড়ত মাইলের পর মাইল। যেন সমুদ্র। শামর্গা ওর কাছে সাত সমুদ্র তের নদীর পারের দেশ তখন। পাটের জমি দেখলেই ভুলু ছইয়ের বাইরে এসে জলের ওপর চুপি দিত। নীল লাল শাড়ি-পরা মাছ দেখত। বড় সরপুঁটি, রুই মাছ দেখলে হৈ-চৈ বাধিয়ে দিত পাটাতনে। মা, যমুনা-পিসি হাত ধরে তখন ফের ছইয়ের নীচে টেনে নিতেন। বার বার তেমন ঘটত। পিসি অন্যমনস্ক রয়েছে, মা দাদুর সঙ্গে ফিসফিস করে গল্প করছে, মাঝিমাল্লাদের সঙ্গে গল্পে মশগুল, তেমন সময় সে গলুইয়ের ওপর চুপি চুপি এসে দাঁড়িয়ে গেছে। তারপর পাটাতনের ওপর চুপি চুপি বসেছে এবং জলের ওপর উপুড় হয়ে থেকেছে যতক্ষণ না মা দেখলেন অথবা পিসি দেখে ফেললেন। জলের নীচের দেশটা অদ্ভুত এক অজানা রহস্যের বিস্মৃতি নিয়ে ওর কাছে ধরা দিত তখন। ঠিক যেন ওর আর একটা পাগল-জ্যাঠামশাই।

উপদ্রবটা ক্রমশ বাড়ত নৌকার গলুইয়ে। দাদু বিরক্ত হয়ে বলতেন, ও শালাভাইকে আর কোনোদিন শামর্গা নিয়ে যাব না।

মা ডাকতেন, ওরে ছইয়ের ভিতর আয়, যমুনা-পিসি তোকে প্রস্তাব বলবে। মধুমালার প্রস্তাব। ভুলু তখন ভালমানুষের মত ভিতরে চলে গিয়ে মার কোলের ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ত।

গড়িয়ে গড়িয়ে প্রকাণ্ড নৌকাটা চলেছে। তেমাল্লা নৌকা, তিনজন মাঝি। লগির ঠুক ঠাক শব্দ সে ভিতর থেকে শুনতে পেত। বাবা গল্প করছেন দাদুর সঙ্গে—একটা লোক জাপানের কোথায় লক্ষ লক্ষ লোক মেরে ফেলেছে। কি করে একটা লোক লক্ষ লক্ষ লোক মেরে ফেলতে পারে সে ভেবে অবাক হত। বাবা বলছেন—জাপানীরা এবারেও হেরে গেল। ভুলু ভাবল হেরে ত যাবেই, একটা লোকই যদি জাপানীদের লক্ষ লক্ষ লোক মেরে ফেলতে পারে, তবে না হেরে আর উপায় কি!—ইংরেজদের এবারেও জিত। বাবা কি সব কথা বলতেন, কিন্তু ভুলু যেন কথাগুলো তখন ধরতে পারত না, বুঝতে পারত না। বাবার কথাগুলো কেমন বিদেশী-বিদেশী গন্ধ। যাঁকে দেখলে তার আনন্দ হয়, কিন্তু আপনার বলে মনে হয় না। দু-তিন মাস পর দুদিনের জন্য তিনি বাড়ি আসেন। তাঁর চেয়ে তার পাগল-জ্যাঠামশাই আরো কাছের।

যমুনা-পিসি গল্প বলতেন, সেই সওদাগর—বড় দুঃখ তার। ছোটরানী, বড়রানী, মেজরানী, কারো ঘরে সন্তান নেই। একদিন এ-ই দাড়িওয়ালা, কপালে এ-ই সিঁদূরের ফোঁটা, এক সাধু এসে উপস্থিত—জয় হোক মহারাজের। যমুনা-পিসি গল্প করার সময় সাধুর কথায় এলে চোখ বড় বড় করতেন, চোখ দুটো জ্বলে উঠত, যেন সেই মধুমালার দেশের সাধু—হুঃ সন্তান তোমার হবে। তবে বারো বছর তোমার ছেলে চন্দ্রসূর্যের মুখ দেখতে পারবে না—যমুনা-পিসি সাধুর মত মোটা গলায় বলতেন। তখন পিসিকে ভয় হত ভুলুর। পিসির টিকি পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠত দেখতে পেত।

বর্ষার জলের সঙ্গে পিসির গল্প মিশে যেত। ঘাট থেকে তিনি প্রস্তাব শুরু করতেন, শামগাঁয়ের ঘাটে প্রস্তাব শেষ হত। ছইয়ের ওপর বৃষ্টির ফোঁটা পড়ত। তখন প্রস্তাব আরো রোমাঞ্চকর মনে হত।

তখন দাদু, বাবা পর্যন্ত সংলগ্ন হয়ে বসতেন। গল্প শুনে ভুলুর ঘুম এসে যেত। —মদনকুমার পাগল হল মধুমালার মুখ দেখে, পিসি বলতেন মাঝিদের, তোরা দোহা টানবি। এবার গল্প জম-জমাট। কিন্তু ততক্ষণে ভুলু ঘুমিয়ে পড়েছে। মা বলতেন, বাঁচা গেল, কি ছেলে বাপ! এক দণ্ড এক জায়গায় বসে থাকতে পারে না। ঘুমের ভিতরও সে-যেন সে সব কথাগুলো শুনতে পেত।

সেই গান আর গল্প, অনেক খাল অনেক বিল পার হয়ে গোপালদীর ঘাটে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য থামত। দাদু এখানে নেমে হাট করতেন। বড় বড় টেকচাঁদা মাছ কিনতেন—মাঝিদের উনুনে রান্না হত। মা রান্না করতেন। ভুলু গোপালদীর হাটে নেমে হৈ-চৈ বাধিয়ে দিত। কত রকমের প্রশ্ন করে বিব্রত করে তুলত মাকে। নর্সিন্দি এখান থেকে কতদূর? ট্রেন দেখতে কেমন? বড় হলে সে মাকে নিয়ে ঢাকা যাবে—কত রকমের কল্পনা; কত রকমের ইঙ্গিতে মাকে খুশী করার চেষ্টা করত ঠিক নেই।

নর্সিন্দি ট্রেনের ইস্টিশান আছে। সেখানে ট্রেন থামে। মা বলেছেন গোপালদীর হাট থেকে ট্রেনের ধোঁয়া দেখা যায়। সে তাই হাটের এক কোণায় অনেকক্ষণ একটা ঢিবির ওপর বসে ছিল। সন্ধ্যের আগে ট্রেন আসবে, গোপালদীর আকাশে সেই ট্রেনের ধোঁয়া জাগবে। সে আকাশের গায়ে সন্ধ্যের আগে ধোঁয়ার মত রেখা দেখেছিল। ওঁরা হেসেছিলেন। কিন্তু শামর্গা থেকে ফিরে পড়শীদের সকলকে সে বলেছে, রেলগাড়ির ধোঁয়া সে দেখেছে!

এই দেখা নিয়ে পড়শীদের কাছে কত গর্ব!

আজ মেঘনায় স্টিমার আসে নি। স্টিমারটার আবার কি হল! স্টিমার দেখে ভেবেছিল বলবে হেনাকে,—হেনা আমি স্টিমার দেখলাম। এই প্রকাণ্ড স্টিমারটা। হেনার শুকনো মুখটা তখন হাসবে। ভুলু এইমাত্র দেখল হারাণ এবং নারাণের মুখটাও শুকনো। সকলেরই ক্ষিদে পেয়েছে। এবার সে ওদের আস্তে আস্তে ডাকল, এই হারাণ, এই নারাণ, ওঠ। সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

ধড়ফড় করে নারাণ উঠে বসল।—আটকে গেছে, আটকে গেছে —বলে চিৎকার করে উঠল। সে পাটাতনের ওপর বসে জলের ওপর ঝুঁকল।

ভুলু নারাণকে ঠেলা দিয়ে বলল, এই কি বলছিস সব! আমরা পিটকিলাগাছের নীচে। এখানে আমরা নৌকা বেঁধেছি।

নারাণের চোখ দুটোতে প্রচণ্ড সংশয়। সে বিশ্বাস করতে পারছে না সে এখন মাঝনদীতে নেই। সংশয়ে চোখ দুটো গোল গোল হয়ে উঠেছে। এদিক-ওদিক চেয়ে সে চোখ রগড়াল। ঘুম-ঘুম ভাবটা গা থেকে ঝেড়ে সোজা হয়ে বসল। কিছু ভাবল যেন। কি ভাবছে? ভাবনাটা সে ঠিক ধরতে পারছে না। অস্পষ্ট। মনের ভিতর ছুঁই-ছুঁই করছে। এবার সে হৈ-চৈ করে উঠল, ওরে ভুলু, কি অদ্ভুত স্বপ্নই না দেখলাম!

—কি স্বপ্ন দেখলি? কি স্বপ্ন দেখে বললি, আটকে গেছে?

—অদ্ভুত স্বপ্ন।—আবার সে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল। মনের ভাবনাটাকে সে যেন এখনও ধরতে পারছে না, ছুঁতে পারছে না। মনের ভিতর তলিয়ে কিছু খুঁজল যেন সে। স্বপ্নের জটগুলোকে ধরতে চাইছে। ওকে খুব অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে এখন। আবার সে হৈ-চৈ বাধিয়ে দিল, ভুলু দেখলাম, হাজার হাজার ঢাইনের ঝাঁক মেঘনার জলের অতলে উঠে আসছে। মাছের রাজা আগে আগে মাছগুলোকে পথ দেখিয়ে চলছে। কি প্রকাণ্ড মাছ! আমাদের নৌকার চেয়ে বড়। মুখটা সিঁদুরের মত লাল। হাঁ করলে আলো জ্বলছে মুখে। অন্যান্য মাছেরা সেই আলোতে পথ দেখছে। জলের নীচে আমি যেন তখন সব দেখতে পাচ্ছি ভুলু। মাছের রাজাটা আমাকে গুঁতো মেরে ফেলে দিল।

নারাণ গড় গড় করে এতক্ষণ বলে গেল। বাকিটুকু মনে করতে পারছে না, আবার সে মনের ভিতর তলিয়ে গেল। ভুলু ওর মুখের দিকে চেয়ে প্রতীক্ষায় আছে। হারাণও উঠে বসেছে এতক্ষণে। চোখ-দুটো গোল করে সেও চেয়ে থাকল।

অনেকক্ষণ ভেবেও নারাণ কিছু বলতে পারল না। সে যেন আন্দাজের ওপর বলল, মাছের রাজাটাকে আমি যেন কি করে শেষে ধরে ফেললাম।

—হয়েছে বাবা, অনেক গল্প শুনেছি আর গল্পে কাজ নেই! হাটে যাবি ত চল। হারাণ এই কথাগুলো শেষ করে পিটকিলাগাছের ডাল থেকে দড়ি খুলতে লাগল। বৈঠায় চারী মেরে আকাশ দেখল সে, মেঘনার ঢেউ দেখল। এবং অদ্ভুত রকমের একটি শব্দ শুনতে পেল মেঘনার বুকে। ভুলু বলল, কোথাও পাড় ভাঙ্গল।

—তুমি কিছু খবর রাখ না। কেবল বই পড়ে ফাস্টই হলে। ওটা ঈশা খাঁর কামান। এখন নাম হয়েছে ওটার মেঘনা-গান। ও-গানের মুখে যে নৌকা পড়বে তার আর রক্ষা নেই।

হারাণ আরও কথা বলত কিন্তু নারাণ ধমক দিল, চুপ কর। যা জানিস না, তা নিয়ে গল্প ফাঁদিস না। লোকে তবে গাঁজাখোর বলবে।

হারাণ এখন চুপ করে কেবল নৌকা বাইছে। দাঁড় জলে ফেলছে আর তুলছে। প্রত্যেকবারের মত এবারেও শপথ করল, আর নারাণের সঙ্গে সে আসে ত মানুষের বাচ্চা নয়। মনে মনে শপথ করে কয়েক গণ্ডূষ জল খেল। ক্ষিদের জন্য যে দাঁড় টানতে পারছে না, সে-কথা সে প্রকাশ করল না।

হাটের কাছে এসে ওরা নৌকা থামাল। কিনা[illegible] ভিড় ক্রমশ পাতলা হয়ে আসছে। যাদের লগি তুলতে দেরি হবে তারা পাটাতনে বসে রোজা ভাঙছে। মশলা-সেদ্ধ ছোলা আর কাঁচা পেঁয়াজ খাচ্ছে। নদীর জল খেয়ে কেউ পিপাসা মেটাচ্ছে।

ভুলু হাটের যজ্ঞিডুমুরগাছটার নীচে গিয়ে নৌকা তুলল। লগি মাটিতে পুঁতে দড়ি বাঁধল। তারপর নারাণ-হারাণকে হাটে পাঠিয়ে দিয়ে সে নৌকায় একা বসে থাকল।

ওরা ফিরল এক সময়। নারাণ মাথায় খড়ের আঁটি বয়ে এনেছে। হারাণের কোঁচড়ের ভিতর অন্যান্য জিনিস। এখন রান্না চড়ানো হবে।

গতকালের উনুন কেনা আছে, হাঁড়ি কেনা আছে। আজ শুধু সেদ্ধ ভাত। তিনটি হাঁসের ডিম কিনে এনেছে নারাণ। কাঁচা লঙ্কা এনেছে, শিশিতে করে সরষের তেল এনেছে এক ছটাক। বাড়ির গেরস্থের মত ভুলুকে এক এক করে সব বুঝিয়ে দিল। এখন ওরা পাটাতনে রান্না চড়াবে।

হারাণ মোমবাতিটা জ্বালাল। দক্ষিণ থেকে বাতাস জোর উঠে আসছে। রান্না করতে খুব কষ্ট হবে এবং দেরি হবে। মুলিবাঁশ-ওয়ালাদের কাছ থেকে দুটো চাটাই নিয়ে এল হারাণ। সে-দুটো উনুনের পাশে ধরে সে বসে থাকল। নারাণও একপাশে বসল। তিনজন ওরা উনুনটার চারিদিকে গোল হয়ে বসে গল্প আরম্ভ করল। দত্তদের বাড়ির খুসির কি সব হয়েছে, এ-সব কথা বলল নারাণ। একদিন সে খুসিকে চুপিচুপি কি সব বলেছিল সে-কথাও খুলে বলল। কিন্তু খুসি কখন কেমন যেমন কথা কয়—আড়ে ঠাড়ে। নারাণ সহজে বুঝতে পারে না। চোখে টান করে খুসি আজকাল ঠিক শঙ্করী-বৌদির মত কথা বলতে শিখে গেছে।

ভুলু কোনো কথা বলে না। নারাণ হারাণ উনুনের আগুনটা দেখছে এখন। আকাশ আবার অন্ধকার হয়ে উঠল। মেঘনার বুকে কালো আঁধারে দুটো-একটা নৌকায় টিপটিপ করে লণ্ঠন জ্বলছে। হাটের দোকানে দোকানে আলো জ্বলছে অনেক। মানুষের হাঁকডাকের শব্দ [illegible] আসছে। দোকানীদের বিক্রি নেই [illegible]লেই চলে। কত বিক্রি হল দেখার জন্য ওরা এবার টাকার থলের ওপর উপুড় হয়ে পড়বে। আনারসের নৌকায় গতরাত্রের মত আবার প্রস্তাব জমে উঠেছে। শঙ্খকুমারের প্রস্তাব। ওদের সব আলাপগুলো পাটাতনে বসে ওরা তিনজন শুনতে পাচ্ছে। রাত যতক্ষণ ঘন না হবে, গভীর না হবে ততক্ষণ ওরা গল্প করবে।

রান্না হলে নারাণ হারাণ এক থালায় খেতে বসল। ভুলু বসল আর এক থালায়, ভিন্ন। মেঘনা থেকে হাওয়া তেমনি জোরে উঠে আসছে। আলোটা দপ দপ করতে করতে একসময় নিবে গেল। ওরা থালা

ছেড়ে উঠল না। অন্ধকারে কোনোরকমে হাতড়ে হাতড়ে খেয়ে নিল সবটুকু ভাত। সারাদিন পর এ-খাওয়াটা আনন্দের, পরম তৃপ্তির। অন্ধকারেই ওরা বড় বড় ঢেকুর তুলল। অন্ধকারেই ওরা বুঝতে পারল বেশ খাওয়া হয়েছে—হাঁসের ডিমসিদ্ধ ভাত, কাঁচা লঙ্কা, গণ্ডূষ করে সরষের তেল। বর্ষার জলে থালা ধুয়ে ওরা হাত মুছতে গিয়ে হাতটা একবার নাকের ওপর ঘষল। বেশ একটা গন্ধ। আঁষটে-আঁষটে ভাব গন্ধটার। অন্ধকারে গন্ধটা মনোরম লাগল।

এবার ওদের শুয়ে পড়া দরকার। হারাণ মুলিবাঁশের ভেড়ীতে চাটাই দুটো রেখে এল। নারাণ গলুইতে বসে গুনগুন করে গান ধরল। ওর গলা মিষ্টি। নর্সিন্দির বাউল গান ওর গলায় মনোরম লাগে। ভুলু বসে বসে নারাণের গান শুনল। হারাণের মন ভাল না। সারাদিন ঝগড়া করে এখন বাড়ির জন্য মনটা উন্মথ। মা টুসটুসীর জন্য কষ্ট হচ্ছে।

আকাশের ভিতর যে গুমোট ভাবটা ছিল, ধীরে ধীরে সেটা খুলছে। ওদের আবার ভিজতে হত। রাতে ঘুম হত না। মশার কামড়ে হাত পা দুটো ফুলে উঠত। তা ছাড়া ওরা বুঝতে পারল, বৃষ্টি হোক বা না হোক, ঘাটে নৌকা থাকলে ওদের মশার কামড় খেতেই হবে। ওরা লগি তুলল সেজন্য। আবার সেই পিটকিলাগাছের ছায়ায় যেয়ে নৌকা বাঁধল।

তারপর এক ঘুম। আর এক রাত। বেশীক্ষণ ওরা জেগে থাকতে পারল না। সারাদিন পরিশ্রমের পর শুয়ে শুয়ে কথা বলবার সময় ওরা ঘুমিয়ে পড়ল। চোখ দুটো অলস হয়েছিল আগেই, এখন চোখ দুটো অবশ হয়েছে।

ভুলুর ঘুম পাতলা। সকলের চেয়ে হালকা। একটা বড় রকমের মাছ নৌকার পাশে এসে চারী মেরেছিল, ওর গায়ে জল এসে পড়েছে। চোখের জলটা ছুঁয়ে বুঝতে পারল মাছটা বেশী নীচে তলায় নি। ধীরে ধীরে চোখ দুটো সে খুলল। আকাশ এখন খুব পরিষ্কার। তারাগুলো ফুটি-ফুটি করছে। চাঁদের আলোটা বিয়েবাড়ির

ডে-লাইটের মত। অনেক উলানী পোকা ওদের মুখের ওপর ভন ভন করছে। দুটো-একটা মশায় পা কামড়েছিল, ভুলু শুয়ে সে-জায়গাগুলো চুলকাল। ওর ইচ্ছা হল একবার উঠে দেখে, মাছটা অনেক নীচে তলিয়ে গেছে, না পাশের কোনো পাতা বঁড়শিতে আটকে গেছে। এমন সময় সাপের আওয়াজটা ভুলুকে বিব্রত করে তুলল। সাপটার যন্ত্রণা হচ্ছে হয়ত। পাটাতনের কাঠ তুলে, ফের কি ভেবে কাঠ নামিয়ে রাখল। কিংবা নারাণের মুখটা হয়ত চোখের ওপর ভেসে উঠল। নারাণ ঘুমিয়ে রয়েছে সুতরাং ওকে না বলে সাপটা ছেড়ে দিলে আনারস চুরি করার মতই চুরি হবে। চুরি করা পাপ, পাগল-জ্যাঠামশাই পর্যন্ত সে কথা বলতেন। পাল বাড়ির বিধবা বুড়ির মাচান থেকে শশা চুরি করে খেলে তিনি চোখ পাকাতেন ভুলু ও শান্তি-র দিকে চেয়ে। শশা খেয়ে একবার ভুলুর জিভে ভয়ানক ঘা হয়েছিল। চুরি করা পাপ কথাটা সেই থেকে মনে প্রাণে সে বিশ্বাস করতে শিখেছে।

না-বলে-কয়ে সাপটাকে ছেড়ে দিলে নারাণকে ঠকানো হবে। পৃথিবীর কাউকে ঠকালে ভগবান সহ্য করেন না। এমন কি পাগল-জ্যাঠামশাইকেও নয়। খুব ছোটবয়সে অত কি সব বুঝত ভুলু! পাগল-জ্যাঠামশাই তামাক খেতে বড় ভালবাসতেন। কিন্তু কবরেজমশাইয়ের বারণ ছিল। হাত কচলে ভুলু শান্তি, অচলকে অনুরোধ করতেন, অনুনয় করতেন তামাকের জন্য। ওরা তখন খালি হুঁকো-কলকে দিয়ে বলত, নাও জ্যাঠু তামাক। পাগল-জ্যাঠুর সরল বিশ্বাস। গুড়ুক গুড়ুক টেনে যখন দেখতেন ধোঁয়া উঠছে না, হুঁকোটা দাওয়ায় ঠেস দিয়ে ওদের তিন-চারজনকে কাঁধে-পিঠে নিয়ে গ্রামের বাইরে বের হয়ে যেতেন। পাগল-জ্যাঠামশাই তখন খুব ভালমানুষের মত কথা বলতেন, আমি তোদের জ্যাঠামশাই হই রে। জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে ঠাট্টা করতে আছে? গুরুজনকে ঠকাতে আছে? পৃথিবীর কাউকে ঠকাবি না, ভগবান তবে রাগ করবেন!

ভুলু তখন কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলত, পাগল-জ্যেঠু, তোমায় আমি আর কোনদিন খালি হুঁকো-কলকে দেব না। তুমি ত পাগল। ভাত দিলে তুমি শুধু ভাত খাও। ডাল দিলে শুধু ডাল খাও, ডাল-ভাত-গুলো যে একসঙ্গে মেখে খেতে হয় তুমি পাগল বলেই ত সে-কথা বুঝতে পার না! মাংস ফেলে আস্ত আস্ত হাড়গুলোকে গিলে ফেল। একদিন যদি একটা গলায় আটকে যায় তবে তুমি ত আর বাঁচবে না জ্যেঠু। তখন আমরা যে কাঁদব।

সে-সময় ভুলুর চোখ দেখে পাগল-জ্যাঠামশাই কেমন অন্যমনস্ক হতেন। এখন এই পিটকিলাগাছের ছায়ায় ও-চোখদুটোকে সে যেন স্মরণ করতে পারছে। সে চোখদুটোর পাশে আরো দুটো চোখ—জ্যাঠামশাইয়ের চোখে কান্না। বৈঠকখানার পাশে একটা আমগাছে জ্যাঠামশাইকে বেঁধে রাখা হয়েছে। বাড়ির সকল ছেলেদের বলে দেওয়া হয়েছে—ওখানে তোমরা যাবে না। ভুলু কিন্তু বৈঠকখানার বেড়ার ফাঁকে উঁকি দিয়ে ব্যাপারটা দেখেছিল। দুদুকাকা জ্যাঠামশাইকে ধরে-ধরে মারছেন। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় জ্যাঠামশাই কাঁদছেন। বৈঠকখানার পাশে জ্যাঠামশাইকে এমনভাবে দুদিন তিনদিন পর্যন্ত ফেলে রাখা হত। বাড়িতে তখন বিষণ্ণ ভাব। ঠাকুমা না-খেয়ে না-দেয়ে চোখ বুজে তক্তপোষে পড়ে আছেন। জ্যেঠিমা কাঁদছেন—মা, কাকীমা তারা ফিসফিস করে কথা বলছেন। একসময় ঠাকুমা ছুটে যেতেন, বলতেন, আর মারিস না, আর মারিস না! আমায় মেরে ফেল আগে, তারপর যা ইচ্ছা তাই কর! ঠাকুমা নিজে জ্যাঠামশাইয়ের হাতপায়ের গিঁটগুলো খুলে দিতেন আর সঙ্গে সঙ্গে জ্যাঠামশাই ঠাকুমাকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতেন।

এমন কেন হত! পিটকিলাগাছের অন্ধকারটার মত অতীতের একটি গাঢ় অন্ধকার কিছুতেই চোখের ওপর স্পষ্ট হয়ে উঠছে না। এখন ভুলু বসে বসে জোনাকিগুলোকেই শুধু জ্বলতে দেখল। অতীতের কোনো খবর সেই আবছায়া অন্ধকার থেকে আহরণ করতে না পেয়ে পাটাতনের উপর ফের শুয়ে পড়ল। কিন্তু

চোখে ঘুম আসছে না। জ্যাঠামশাই এখন কোথায় কে জানে! আকাশের কোন নক্ষত্রটি ঠাকুর্দার মুখ? ঠাকুর্দার মৃত্যুর দিনে সে পুকুরের জলে সূর্যের ছায়া দেখেছিল, সূর্যের চারিদিকে গোল একটি কালো মণ্ডল পড়েছে কিনা দেখেছিল। ভগবানেরা সব গোল হয়ে সভা করতে বসেছেন কিনা জানতে চেয়েছিল জলে সূর্যের ছায়া দেখে।

সব মহাপুরুষদের মৃত্যুর দিনের মত ঠাকুর্দার মৃত্যুর দিনেও ভগবানেরা সব সূর্যের চারিদিকে গোল হয়ে বসেছিল। সুতরাং ঠাকুর্দা আর কোথাও জন্ম নেবেন না। আকাশের নক্ষত্র হয়ে পৃথিবীর সব সুখ দুঃখ দেখবেন। ওর ধারণা তিনি নিশ্চয়ই ভুলুকে এখন দেখতে পাচ্ছেন। ভুলু শুয়ে শুয়ে এখন কেবল আকাশের গায়ে ঠাকুর্দার মুখটাকে খুঁজছে। ঠাকুর্দা নিশ্চয়ই জানেন তাঁর পাগল ছেলে এখন কোথায়। আকাশ থেকে তিনি তাঁর পাগল ছেলেকে চোখে চোখে রাখছেন।

ওর মনের ভিতর কতগুলো চিন্তা অদ্ভুতভাবে গুলিয়ে উঠছে। রাত-জাগা পাখিরা ডানা ঝাপটাল, জোনাকিগুলো নড়ছে, একটা-দুটো নক্ষত্র আকাশে কাঁপছে। ঝোপের বেতপাতাগুলো নড়ছিল—পাতাগুলো সাদা কাপড়-পড়া বিধবা বৌয়ের মত। ওর ভয় ধরেছে। ঠাকুর্দার মৃত্যুর কথা মনে হল ওর—মৃত্যুটা ভূত-প্রেতের মত হয়ে চোখের উপর নাচছে। মা বলেছিল অনেকদিন পরে, ঠাকুর্দা তোর সোনা-জ্যাঠামশাইকেই শ্রাদ্ধের মালিক করে গিয়েছিলেন. তোর বড় জ্যাঠামশাই তখন তোর ঠাকুর্দার বিছানার পাশে। পাগল হলেও তিনি সব বুঝতে পারতেন। ঠাকুর্দা জানতেন রাতে তাঁর মৃত্যু হবে। ওটা নাকি ওঁর ইচ্ছামৃত্যু।—উপেন, ক্ষীরোদটাত পাগল, শ্রাদ্ধের মালিক তোকেই করে গেলাম। আমার মন্দ কপাল। বড় ছেলে, আমার কপালে শুধু দুঃখই আনল। ওকে তুই দেখিস। ওর বৌটা থাকল, দুটো বাচ্চা থাকল! সকলের ভার তোর ওপর! ঠাকুর্দা মৃত্যুর আগের দিন এমন সব কথাও বলেছিলেন।

নৌকার পাটাতনে বসে ভুলুর মনে হল ঠাকুর্দা সোনা-জ্যাঠামশাইকে ও-সব কথাগুলো না বললেও পারতেন। ওর আবার ইচ্ছা হল আকাশটা দেখতে। সেই নক্ষত্রটা দেখতে—যেটা একমাত্র ঠাকুর্দার মুখ। ভুলু সব আকাশটা প্রথম খুঁজল। উত্তর দিকে যে নক্ষত্রটা সকলের চেয়ে বেশী জ্বলজ্বল করছে ওটাই ঠাকুর্দার মুখ ভাবতে ইচ্ছা হল। এখন সে ইচ্ছা করলে নালিশ জানাতে পারে। যে ভয়টা মনের গুঁড়ি ধরে বেয়ে উঠেছিল, নক্ষত্রের ভিতর ঠাকুর্দার মুখটা উপলব্ধি করে সে ভয় থেকে ভুলু মুক্ত হল। বেতপাতাগুলো এখন ওর কাছে বেতপাতা, পিটগাছের ছায়া একটা ছায়াই। জোনাকিগুলোকে আর সে দেখতেই পেল না। রাত-জাগা পাখিরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে, ওর শুধু ঘুম এল না। ঘুম আসছে না। কাল সকাল-সকাল জাগতে হবে। ঢাঁইন মাছ কাল হয়ত উঠবে। আকাশের গায়ে ঠাকুর্দা-নক্ষত্র থেকে জানতে ইচ্ছা হল কাল ঢাঁইন মাছ আটকাবে কি আটকাবে না। মা বলত, ঠাকুর্দা ঢাঁইন মাছের পেটি খেতে বড় ভালবাসতেন। বুড়ো-বয়সে বিছানা থেকে উঠতে পারতেন না, খাবার শখ বুড়োর তবু যায় নি। কফ ফেলতেন, কাশি লেগেই থাকত। তবু হাঁপের টানের সঙ্গে বলতেন, উপেন, অভি! (মেজ সেজকে সম্বোধন)—বড় বড় ছানার জিলিপি আনবি। এক হাঁড়ি। ডাবা নাকি আজকাল ভাল মিষ্টি বানায়। বাড়িতে তখন হাঁড়ি হাঁড়ি মিষ্টি আসত। আর কি সস্তা! ভুলু যেন স্পষ্ট মনে করতে পারল, মা দুবার দশ সের রসগোল্লা দশ আনায় রেখেছিল। একবার সোনা-ঠাকুর্দা যখন গুরুমন্ত্র নেন, আর-একবার আলোপিসির বিয়েতে। সম্মান্দীর বাড়িতে বিয়ে হয়েছিল। রনা-ধনা সব সম্মান্দীর বাড়িতে ভোজ খেতে গেছে। রাইনাদীর বাড়ি খালি। খালি বাড়িতে ভুলু নিঃসঙ্গ বোধ করত। বাড়িতে একদল মানুষ সকলে পুঁটলি নিয়ে গেছে। ভুলুর যাবার ইচ্ছা খুব। কিন্তু মাকে বাদে সে কোথাও থাকতে পারে না। মনটা অত্যন্ত মা-মা করত। কাঁদত। এখনও কাঁদে। কিন্তু মা বলেছে, দুঃখে সুখে তোমাকে মানুষ হতে হবে, লেখাপড়া শিখতে হবে। তুমি গরীবের ছেলে।

হাটে একটা আলো জ্বলছে না। ঢেউয়ের গর্জন আসছে কেবল। দু-একটা আলো শুধু নদীর ওপরই জ্বলছে। হারাণ-নারাণের নাক গড় গড় করছে। এই সব দেখতে দেখতে ভুলুর ভাবতে ইচ্ছা হল, বাবা এত গরীব হয়ে গেলেন কি করে। বাবাকে ভিন্ন করে দিয়েছে কেন? দুদুকাকা নিজে ইচ্ছা করে ভিন্ন হলেন কেন? কাকীমা এমনভাবে সারাদিন জুতা পায়ে দিয়ে হাঁটাহাঁটি করতেন কেন? কাকীমার কথাগুলো খুব অপরিচিত শব্দ। দুদুকাকা কাকীমাকে বিয়ে করেই ত অন্যমানুষ হয়ে গেলেন। ভুলুকে তিনি আর তেমন ভালবাসতেন না। মাকে জ্যেঠিমাকে সারাদিন গাল-মন্দ দিতেন। একদিন ভুলু দেখল বৈঠকখানার পাশে একটা ছোট্ট ঘর উঠেছে। দুদুকাকা সেখানে নিজের হাতে রান্না চড়িয়েছেন। কাকীমা ইচ্ছা করেই তখন বাপের বাড়ি। কাকার খুব কষ্ট হচ্ছে রান্না করতে। ভুলুর তাই দেখে কাঁদতে ইচ্ছা হয়েছিল। একসঙ্গে বড় রান্নাঘরটায় সকলে আর খেতে বসতে পারবে না। রান্নাঘরটা ভাগ ভাগ হয়ে গেল। ভিন্ন হওয়ার পরই ত সোনা-ঠাকুর্দা বাবার অবস্থা দেখে ভুলুকে সম্মান্দী নিয়ে আসার প্রস্তাব করলেন এবং নিয়ে এলেন। মা সঙ্গে এসেছিল। কাকীমার হাত ধরে মা বলেছিল, এও তোর ছেলে। এ-কাকীমা অন্য কাকীমা। অন্য মানুষ। তাঁর একমাত্র ছেলের মত করে মানুষ করতে পারবেন না বলে স্পষ্ট জবাব দিয়েছিলেন। মায়ের সেই চোখের জলটা পিটকিলাগাছের ভিতর দিয়ে মেঘনার জলে মিশে গেছে, দেখতে পেল ভুলু।

মায়ের চোখের জলটাই ভুলুর মনে অনেকগুলো প্রত্যাশার জন্ম দিয়েছে। বাবার অনুভূতি, চুপচাপ থাকা, পাগল-জ্যাঠামশাইয়ের সরল মন—ওর মনে অনেক সরল বিশ্বাস জন্মিয়েছে। বাবা অদ্ভুত মানুষ, তার কাছে অসাধারণ মানুষ। এই কথাগুলো পিটকিলাগাছের নীচে বসে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হল। নতুবা কাকীমা বাড়ির চাকরের মত দিনরাত খাটায়, তাকে ছুটির দিনে ভাল করে পড়তে দেয় না—তুমি বাজারে যাও, ধান ভেনে দাও, ঠাকুর পূজো কর, গরু মাঠে আছে

নিয়ে এস—এইসব কাজগুলোর ভিতর দিয়ে সে যেন নিজেকে বাবার মত হতে শিক্ষা দিচ্ছে। জ্যাঠামশাইয়ের মত হতে সে চেষ্টা করছে। সে কাকীমাকে সেজন্যই কোনোদিন বলল না,আমার পড়া হয় নি, অন্য কাউকে বল। বাবা বলেছেন গুরুজনের অবাধ্য হতে নেই। ভগবান কি, তিনি কেমন—তিনি ত সকলের ইচ্ছা পূরণ করেন (বাবার কথা), কৈ আমাদের ইচ্ছা, হারাণ-নারাণের ইচ্ছা তিনি ত পূরণ করলেন না। কাল হয়ত করবেন। আকাশে ঠাকুর্দাকে আবার দেখল সে। তার মুখ দেখল।—তুমি ত ঠাকুর্দা খুব কাছাকাছি রয়েছ, বেশ মজা। তোমার কি হবে সব কথাই ত তুমি জেনে নিতে পার ভগবানের কাছ থেকে। আমার কি হবে? বড় হব? মানুষের মত বড় হতে পারব ত! মা যে মানুষটার মত হতে বলেছে, সেই মানুষ।

ভুলু দুটো হাত বুকের ওপর রেখেছে। ডান পাটা বাঁ পায়ের ওপর রেখে দোলাচ্ছে। নৌকাটা নড়ছিল। জল কাঁপছে। ওদের ঘুম ভেঙে যাবে। সে পা-নাচুনি থামিয়ে দিল। একপাশে ফিরে শুল। পাশ ফিরে শুয়ে মনে হল কতকটা সুবিধে। খুব গরম, বৃষ্টি হয়ে গরম বেড়েছে। যে বাতাসটা মেঘনা থেকে উঠে আসছিল সেও যেন পড়ে গেল। নদীতে এখন আর লণ্ঠন জ্বলছে না। কতকগুলো পাখি আবার ঝোপের ভিতর ডাকল, ডানা ঝাপটাল। পাখিরা প্রহরে প্রহরে জাগে। ভুলু বুঝল সে একপ্রহর ধরে বাড়ির সকলকে ভেবেছে। নিজের ভবিষ্যৎ ভেবেছে! চেষ্টা করে ঘুমোনো যায় কিনা সেই চেষ্টাও করেছে। তখন কিন্তু সে ঘুমুতে পারল না। যখন জানল আর ঘুম আসবে না, শুয়ে শুয়ে কালকের চিন্তা করা যাক, তখনই সে ঘুমোল। বড় মাছটা জলে আবার চারী মেরেছে। এবারের আওয়াজে ঘুম ওর আর ভাঙল না। ভুলু ঘুমোল আর ঘুমোল। নদীর জল বর্ষার জল এখন এক হয়ে গেছে।

শেষরাতের দিকে ভুলু আর একেবারের মত জাগল। সে অত্যন্ত অবাক হয়েছে, বিস্ময় মেনেছে। নৌকাটা পিটকিলাগাছের নীচে

সেই হাটের পাশে। যজ্ঞিডুমুরগাছের নীচে বাঁধা। ওর বুক কেঁপে উঠল। ভূতপ্রেতের কাণ্ড নয়ত! ভুলু পৈতায় হাত রেখে গায়ত্রী জপ করল। অন্ধকার। আকাশের সেই ডে-লাইটের আলোটা কিছুক্ষণ আগে বুঝি নিভে গেছে। কিংবা আকাশে আবার মেঘ জমেছে। যজ্ঞিডুমুরগাছটা ঠিক পঞ্চবটীর ভূতুড়ে বটগাছটার মত। তেমনি কালো আর তেমনি অন্ধকার। হাটের ভিতর কতকগুলো কুকুর-শেয়ালের চিৎকার শোনা গেল। আনারস-কাঁঠালের নৌকা সব লগি তুলে ভাটির মুখে ছেড়ে দিয়েছে। কাঁঠালের বোঁথা নিয়ে এখন নিশ্চয়ই শেয়ালদের ভিতর ঝগড়া হচ্ছে। সে ডাকল, নারাণ! নারাণ!!

কোনো শব্দ এল না। নৌকার পাটাতনেও যেন কেউ নেই। সে হাতড়াতে থাকল। একজনকে পেল, এবং চুলে হাত দিয়ে বুঝতে পারল হারাণ ঘুমুচ্ছে। হারাণ নৌকার পাটাতনে নেই, নৌকার কোথাও নেই। কোথায় গেল!—হারাণ! হারাণ!! ভুলু দুবার ডাকল এবং গলাটা ভয়ে শুকিয়ে যাওয়ায় আর ডাকতে পর্যন্ত পারল না। হারাণ তখন গোঙাল। সকলকে কি একসঙ্গে ভূতে পেয়েছে! নিশির ডাকে পায় নি ত নারাণকে? হারাণ কি ঘুমের ঘোরে এমন করল! না ওকেও নিশির ডাক ডাকছে। সে আর ভাবতে পারছে না। ভয়ে হাত পা সব গুটিয়ে আসছে। যজ্ঞিডুমুরগাছের নীচ থেকে ঠাকুর্দার মুখ দেখার চেষ্টা করল সে। কিন্তু সেই মুখটাও আকাশের গা থেকে যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ভুলু ভীষণভাবে অসহায় বোধ করতে থাকল আর হারাণের হাত ধরে টানতে থাকল, এই ওঠ ওঠ। নারাণ কোথায় যেন চলে গেছে। ওকে পাওয়া যাচ্ছে না! নিশির ডাকে পায় নি ত ওকে?

—নিশির ডাক! ওরে বাবা, কি বলছিস? নিশির ডাক!! হারাণ বলতে বলতে ধড়ফড় করে উঠে বসল। চোখ মুছল দু-তিনবার করে।—ওরে ভুলু তুই আমার কাছে আয়। তোর পৈতে ধরে বসে

থাকি। কেন এলুম রে বাবা! কি দরকার ছিল রে টুসটুসী! তোর পেটটার জন্যই ত আমার এত যন্ত্রণা।

ভুলু হারাণের কাছে গেল। ভুলুকে হারাণ দুহাতে জড়িয়ে ধরল।—তুই যাস না কোথাও, তোর দু পায়ে পড়ি। তোর হাত দে।

ভুলু ভাবল হারাণকে ডেকে ঠিক হল না। হারাণের চিৎকারে ভুলুর ভয়টা আরো বাড়ছে। চারিদিকের অন্ধকারটা বেশী করে যেন গিলতে আসছে। অন্ধকারে মঠ, হাটের চালাঘর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ভুলু জোরে জোরে ডাকল—নারাণ! নারাণ!! কোনো উত্তর পেল না সে। শুধু পাড়-ভাঙার শব্দ। ঈশা খাঁর কামানটা মাঝে মাঝে এখনও গর্জাচ্ছে।

ভুলু ফিসফিস করে বলল, হারাণ ভয় পাস নে। বামুনদের কাছে ভূত-প্রেত কিছু আসতে পারে না। ভয় না পেলে তোকে আর একটা কথা বলতে পারি।

হারাণ ভয়ে চোখ বুজে ছিল। সে চোখ আর খুলল না। অন্ধকারটাকেই সে সকলের চেয়ে বেশী ভয় পাচ্ছে। চোখ বুজেই বলল, না ভয় পাব না। তুই আছিস, তোর পৈতে আছে, তবে ভয় পাব কেন! তুই বল।

নদীর বুক কেটে যেন একটা আলো ক্রমশ ওপরের দিকে উঠে আসছে। সমস্ত নদীটা আলোকিত হয়ে উঠল। একটা শব্দ উঠছে—শব্দটা ঝিঁ ঝিঁ পোকার মত। বিচিত্র শব্দ শুনছে সে। বিচিত্র চিন্তা ভুলুর। হারাণকে বলবে কি বলবে না ভাবল। আলোটাকে নীচের দিকে নেমে আসতে দেখল আবার। নদীর বুকে পড়ল আলোটা—ডানদিক, বাঁদিক সরে সরে তীর দেখছে। তীরের রেখা দেখছে। বিচিত্র শব্দটাও খুব কাছাকাছি এসে গেল যেন। হারাণ ততক্ষণে অধৈর্য হয়ে উঠেছে।—ওরে ভুলু তুই চুপ করে রয়েছিস! বল কিছু। কথা না বললে আমি আরো ভয় পাচ্ছি।

—বলব কি! চোখে দেখতে পাচ্ছিস না?

—কি দেখব, ওরে বাবা আমি যে চোখ বুজে আছি!

—চোখ খুলে দেখ নদীর বুকে কত আলো!

হারাণ খুশী হল।—আলো! কৈ কৈ! আরে গোলাপদীর স্টিমার আসছে। নারাণ নারাণ। কোথায় গেলি রে নারাণ! এই ওঠ ওঠ। এ-আলোতে চল নারাণকে খুঁজে দেখি। নিশির ডাক না ছাই! ঐ দেখ নারাণটা কি করছে!

ভুলু নৌকার গলুইতে বসে দেখল নারাণ মঠের দরজা ঠেলছে। নারাণকে দেখে ভুলুর সব ভয় কেটে গেল। কিন্তু নারাণ মঠের দরজা ঠেলছে কেন! ভুলু ডাকল, এই নারাণ, নারাণ, কি করছিস ওখানে?

সে উত্তর না করে মঠের অন্য পাশে নিজেকে আড়াল দিয়ে দাঁড়াল। হারাণ লাফ দিয়ে নৌকা থেকে মাটিতে নামল। যজ্ঞি-ডুমুরগাছটার নীচ দিয়ে হাঁটছে। ভুলুও নামল। আলোতে পথ চিনতে ওদের কষ্ট হচ্ছে না। তিন-চারটা শেয়ালের চোখ স্টিমারের আলোতে ধাঁধা লেগে গেছে। শেয়ালগুলো ভুলু এবং হারাণকে দেখে এতটুকু নড়ল না। নারাণ নিজেই মঠের সিঁড়ি ধরে নেমে এল তখন। ওদের কাছে এসে আফসোস করতে থাকল, তোদের জন্য আমি আর মাছের রাজা হতে পারলুম না।

নারাণের ক্রমশ আক্ষেপ বাড়ছে। আজ নির্ঘাত সে মাছের রাজা হতে পারত, ভুলু এবং নারাণ সব নষ্ট করে দিল। নারাণ চোখগুলো গোল গোল করে বলল, জানিস দামোদরদীর মঠ, মানুষ হয়ে আমার কাছে গিয়েছিল। পিটকিলাগাছের নীচে তোরা ত অঘোরে ঘুমোচ্ছিস। পুরুষমানুষের অত ঘুম ভালো নয়। মানুষটা আমার নৌকার গলুইয়ে বসে বললে, এই নারাণ, ওঠ তুই ত মাছের রাজা হতে চাস। আমার সঙ্গে আয়, মাছের রাজা হতে পারবি। আমি দড়ি খুললাম নৌকার। ডুমুরগাছের নীচে নৌকা বাঁধলাম। মানুষটা আমার আগে আগে গিয়ে মঠের দরজার সামনে দাঁড়াল। মঠের সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠছি আর দেখছি দরজাটা খুলে গেল। লোকটা ভিতরে ঢুকে যেতেই দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল। তারপর ডাকলাম কত ডাক।

দরজা ঠেলছি, কিন্তু সেই যে লোকটা মঠের ভিতর ঢুকে গেল আর বের হবার নাম করল না। যদিও বের হত, তোদের দেখে আর তাও হল না। মাছের রাজা হওয়া আমার কপালে বুঝি নেই। ঠোঁট উল্টাল নারাণ। গোল গোল চোখ সে এবার লম্বা করে দিল।

হারাণ আবার ভুলুকে জড়িয়ে ধরেছে।—এযে দেখছি সব ভূত-টুতের কাণ্ড। ভুলু তুই ওকে ছুঁবি না। নারাণটা ভূত, নারাণ ভূত হয়ে গেছে!

নারাণ হা হা করে হাসল।—ভূতের ত খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই।

ভুলু বললে, এটা নিশির ডাক নারাণ। চাঁইন মাছ ধরে আর কাজ নেই। ভোরে বাড়ির দিকে চল। নয়ত হারাণ শেষ পর্যন্ত ভয়েই মরবে।

নারাণ ফের হাসল। বলল, তোরা ভয়ে জুজুবুড়ি। ঠিক আছে; কাল আর এখানে নৌকা রাখব না। বৈদ্যের বাজারেই নৌকা রাখব। রাতে সেখানে কিছু কিছু মাছ-ধরার নৌকা থাকে। নারাণ ওদের মুখের দিকে চেয়ে বুঝল ওরা সত্যি খুব ভয় পেয়েছে। সে এতক্ষণ পর নিজের চেতনাও যেন ফিরে পাচ্ছে। সত্যি ত এমন কেন হল! কে তাকে এই হাটে ডেকে এনেছে। মঠের দরজা খোলে না, অথচ সে স্পষ্ট দেখল দরজাটা ওর চোখের ওপর খুলে গেছে। মানুষটা ভিতরে ঢুকে গেল। মানুষটার মুখও সে মনে করতে পারছে—ঠিক ডেঙ্গুরে-জ্যাঠার মত। তেমনি ঢ্যাঙা রোগাটে। চোখ দুটো ঘোলা ঘোলা। মাথার চুল খাটো করে ছাঁটা। গলায় শঙ্খিনীর হাড়। নারাণ হাঁটতে থাকল। সে আর ওদের কিছু বলল না। মনে মনে সে ভয় পাচ্ছে। কিন্তু ভয়টা প্রকাশ করলে এই নির্জন হাটে সমস্ত রাত ওরা শক্ত হয়ে থাকবে। নারাণ পিছন ফিরে স্টিমারের আলোতে দেখল ওরা তখনও দাঁড়িয়ে আছে, নড়ছে না, ওরা দুজন জড়াজড়ি করে নারাণকে দেখছে। আলোটা সরে গিয়ে তখন একেবারে অন্ধকার হল। স্টিমারের দিকে চেয়ে নারাণ সাহস সঞ্চয় করল। সে হাসল হা-হা করে। অন্ধকারটাকে হাল্‌কা করে দেবার জন্যই হাসল।—ভুলু,

হারাণ, তোরা বুঝতে পারলি না, তোদের ভয় দেখাবার জন্য আমি এমনটা করলাম। আয় আয়। চল, আবার পিটকিলাগাছের নীচে গিয়ে শুয়ে পড়ি।

ভুলু পৈতেটার কথা মনে করতে পারল। পৈতে ধরে গায়ত্রী জপ করছে ফের। হারাণকে নিয়ে সে নৌকায় উঠল। নারাণ লগি ঠেলে কোনোরকমে পিটকিলাগাছ পর্যন্ত এসে ধপাস করে গলুইয়ের ওপর বসে পড়ল। হারাণ ও ভুলুকে ডাকল সে।—তোরা কাছে আয়। একটা কথা বললে ভয় পাবি না? আমরা কাঠের ওপর আছি। কাঠে লোহা আছে। তোরা জানবি লোহাকে ভূতেরা ভয় পায়। তা ছাড়া ভুলু তোর পৈতে আছে, ভয় পাস না বলছি। জানিস, ডেঙ্গুরে জ্যাঠা নির্ঘাত আজ মারা গেছে।

ভুলু হারাণ চমকে উঠল।—কি বলছিস!

—আমি ঠিক বলছি। দেখবি তোরা, পরশু ত আমরা ফিরব, তখন দেখবি। আমি আজ ডেঙ্গুরে-জ্যাঠাকে স্বপ্ন দেখলাম। ডেঙ্গুরে-জ্যাঠা মরে আমাকে মাছের রাজা করে দিয়ে গেল।

নারাণের অদ্ভুতভাবে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হল সে মাছের রাজা হয়ে গেছে। আর এও তার বিশ্বাস যে ডেঙ্গুরে-জ্যাঠা শেষবারের মত বৈতরণী পার হবার সময় ওর সঙ্গে দেখা করে গেল। (এ অঞ্চলের মানুষদের বৈতরণী এই মেঘনা, নারাণের এটাও একটা বিশ্বাস)। গ্রামে ডেঙ্গুরে-জ্যাঠার পর মাছের রাজা তাকেই করে গেল। অন্ধকার রাত। পাখিরা শেষ প্রহরের ডাক ডাকছে। টিট্টিভ পাখিদের শব্দ শুনতে পাচ্ছে নারাণ। গরীপড়দীর গয়না-নৌকার মাঝিদের হাঁক আসছে—এই সব রাতের বিচিত্র কাজগুলোর ভিতর ওরা চুপচাপ। পিটকিলাগাছের ছায়াটা ওদের কাছে এখন একটা ঘন অন্ধকার। ওরা গোল হয়ে বসে পিটকিলাগাছের ঘন অন্ধকারটার সঙ্গে রাতের অন্ধকারটা আগলাচ্ছে।

॥ চার ॥

যখন ভোর হল, যখন জলের রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তখন নারাণ বৈঠা হাতে নিয়ে দাঁড়াল। বলল, জয় বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী। বৈঠা ওপরের দিকে তুলে সে হাঁক দিল—বাবা লোকনাথ, তোমার নাম করে বের হলাম।

ভুলুর ইচ্ছে হল বলতে, কি হবে গিয়ে। মাছ উঠবে না, তাছাড়া হারাণ নারাজ। হারাণকে বলে দেখ সে যেতে রাজী কিনা। নয়ত বাড়ি ফিরে যাই। বাড়ির ছেলে বাড়িতে গিয়ে উঠি। হারাণটা কাল ভয়ে হয়ত মরেই যেত। ভোরের এত আলো দেখেও ওর ভয় যেন কাটে নি। ভুলু হারাণের দিকে চাইল। নারাণ গাছের ডাল থেকে দড়ি খুলছে, হারাণ তবু কিছু বলছে না। হারাণের কি তবে ইচ্ছা আবার নদীতে গিয়ে নৌকাটা নামুক, বঁড়শি ফেলা হোক। হারাণ যদি চায় তবে ভুলুরই বা আপত্তি কি! হারাণ দড়ি খুলছে খুলুক। নারাণ বলেছে, সে মাছের রাজা। ভুলু ডাকল, নারাণ।

গলুই থেকে নারাণ মুখ ফেরাল, আমাকে বলছিস?

—কি করে বুঝলি ডেঙ্গুরে-জ্যাঠার মত মাছের রাজা হয়ে গেছিস তুই?

—আমার বিশ্বাস। মনটা কেন জানি বার বার বলছে, তুই মাছের রাজা নারাণ। ডেঙ্গুরে-জ্যাঠা রাতে তোর সঙ্গে দেখা করে গেছে, তোকে মাছের রাজা করে দিয়ে গেছে?

—তোর মন বলছে আজ তবে মাছ উঠবে?

—উঠবে, দেখবি আজ বঁড়শিতে ঠিক মাছ আটকাবে।

—কিন্তু কাল যে হারাণ বলছিল সে আর নৌকায় থাকবে না। ওর কি ব্যবস্থা করবি?

—কি রে, সত্যি থাকবি না ?—নারাণ প্রশ্ন করে করে হারাণের মনটা জানতে চাইল।—কিচ্ছু ভয় নেই। আজ যদি চাঁইন মাছ না পাই তবে সত্যি ফিরে যাব। আমার কথায় আজ দিনটা অন্তত দেখ।—কথাগুলো নারাণ অত্যন্ত নরমস্বুরে বলল।

হারাণকে দেখে মনে হল নারাণের জন্য সে এখন সব করতে পারে। এমন কি প্রাণ দিতে পারে। সে ত এরকমই কিছু একটা চেয়েছিল। নারাণ ওর সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলুক। হারাণ এবার নারাণের পাশে গিয়ে বসল। হাত তুলে বলল, জয় বাবা লোকনাথ।

ভুলু বর্ষার জলে হাত ভিজাল, মুখ ভিজাল। কিছু খেয়ে বের হতে হবে! বাজারের দিকে গেলে হয়। চিঁড়ে-গুড় কিনতে হবে। চোখগুলো জ্বলছে। চোখে মুখে সে জল দিল। রাতে ভাল ঘুম হয় না। কী সব রাতভোর ভেবেছ। রাতে ঘুম না এলে রাজ্যের সব চিন্তা ওর চোখের ওপর ভিড় করে। ভুলুর ভিতরের মানুষটা তখন গুড়ি গুড়ি বের হয়ে আসে। ওর চোখের সামনে উপদেশ দেবার ভঙ্গিতে দাঁড়ায়।

ভুলুর এ-কথাও মনে হল, যে-সব কথাগুলোকে রাতে বেশী গুরুত্ব দেয়, যে-সব ভাবনাগুলো রাতে ওকে বেশী নাকাল করে তোলে, ভোরের এই আলোয় তা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। সে বুঝতে পারে রাত আর দিনের তফাত শুধু একটা অন্ধকার। আর ত কোনো ফারাক নেই। পিটকিলাগাছটা এখন যেমন দাঁড়িয়ে আছে, রাতেও ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে ছিল। বাজারের যজ্ঞিডুমুরগাছটা কত আপনার মনে হচ্ছে এখন। অথচ রাতের অন্ধকারে ওরা সব ভয়ানক হয়ে গেছিল। বীভৎস রূপ ধরেছিল যেন। দিনের আলোয় যে চিন্তাগুলো মনের ভিতর এতটুকু ঠাঁই পায় না, রাতে তারাই ওকে যন্ত্রণা দিতে আসে। এখন ত ওর এক ভাবনা—চাঁইন মাছ, উজানে টানা, বঁড়শি ফেলা। হারাণের বঁড়শি গতকাল ছিঁড়ে গেছে। সেই সময়টুকুর কথা ভাবল ভুলু। হারাণের মুখটা সে-সময়টা অদ্ভুত করুণ দেখাচ্ছিল।

গাছের ছায়া থেকে ওরা নৌকা ছেড়ে দিয়েছে। বাজারে নৌকা ভিড়িয়ে চিঁড়ে-গুড় কিনল নারাণ। তারপর ফের নৌকা ছাড়ল। ওরা তিনজন একসঙ্গে বলল, জয় বাবা লোকনাথ। ওরা নৌকা বাইল। একটা কাক এসে গলুইতে বসেছিল, হারাণ উড়িয়ে দিয়েছে কাকটাকে। ভুলু উঁকি দিয়ে জলের নীচে বেলেমাছ দেখল। ওরা চিঁড়ে-গুড় খাচ্ছে এখন। মাঝগাঙে পড়তে এখনও অনেক দেরি।

আট-দশটি গাদা-বোট মাঝগাঙে। গাদা-বোট বাদাম তুলেছে। গাদা-বোট পাটে বোঝাই। ওরা মেঘনার ঘাটে ঘাটে পাট বোঝাই করেছে। ওরা পাট নিয়ে নারাণগঞ্জ যাবে। স্রোতের টানে আর বাদামের হাওয়ায় মাঝগাঙে গড়গড়িয়ে চলছে তারা। মাঝিরা নিশ্চিন্ত। ওরা ভোরের নাস্তা করছে। শুঁটকি মাছের বাটা আর পান্তাভাত। তেমন খাওয়া ভুলুরও খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। ভুলু নাক টানল।

'জয় বাবা লোকনাথ' বলে একসময় ওরা বঁড়শিও ছুঁড়ে দিল। এক এক করে আরো সব নাও ভিড়ছে। একটা দুটো করে অনেকগুলো। গতকালের মত। অন্যান্য দিনের মত। নাওগুলো মাঝগাঙ ধরে আবার যুদ্ধজয়ের মত চলেছে। এখন ওরা একাগ্রচিত্ত। অন্য কথা নেই অন্য চিন্তা নেই। অন্যমনস্ক হলে মাছটার খোঁট ওরা ধরতে পারবে না। হারাণ এখন হালে। ভুলু আর নারাণ উপুড় হয়ে পড়েছে জলের ওপর।

ওরা তিনজন আর কোনো কথাই বলবে না অন্তত তেমন বিশেষ কিছু ঘটনা না ঘটলে। ওরা তিনজন চুপ করে থাকবে অন্তত যতক্ষণ চুপ করে থাকা যায়। হারাণের শুধু বসে থাকা হালে। সে ঘাড় ফিরিয়ে এদিক-ওদিক চাইতে পারে—অন্যান্য দুজন অন্তত তাতে কিছু আপত্তি করবে না। তবে যেন খেয়াল থাকে নৌকা ঘূর্ণির মুখে না পড়ে; অথবা অন্য নৌকার সঙ্গে ঠোক্কর না খায়। কাজেই হারাণ ঘাড় ফিরিয়ে বাজার, তীর, তীরের মানুষ, গুদারা-নাও, নদীর ঘাটে বাসন-ধুতে-আসা বৌ, সকলকে সে ঘূর্ণি দেখার ফাঁকে ফাঁকে দেখে

ফেলল। ভুলু, নারাণ ঘাড়-পিঠ যখন অত্যন্ত ধরে ওঠে তখন একটু সোজা হয়ে বসে। পাশের নৌকাগুলোকে দেখে। কার নৌকায় প্রথম ঢাঁইন উঠবে সে প্রত্যাশায় দণ্ড-পল গোনে।

—জয় বাবা লোকনাথ—নারাণ ফের লোকনাথ ব্রহ্মচারীর স্মরণ নিল। তুমি সহায় হও লোকনাথ। বারদীর নাগেদের তুমিই ত এত বড় করলে বাবা। তুমি ত মরার পরও মানুষের সঙ্গে দেখা কর। (যেমন ডেঙ্গুরে-জ্যাঠা মরার পর ওর সঙ্গে দেখা করে গেল)। তুমি ভাবছ আমরা কিছুই জানি না। সব জানি, সব শুনি, সব খবর রাখি। বন্দরের গুদারাঘাটে চৈতন্য নাগের বাপের সঙ্গে দেখা করেছিলে তুমি। চৈতন্য নাগের বাপ সেদিন বারদী এসে দেখল, তোমাকে আগুনে পোড়ানো হচ্ছে। বাবা লোকনাথ, আমরা সব জানি। ডেঙ্গুরে-জ্যাঠা কালকে আমার সঙ্গে দেখা করে গেল। মরার পর মানুষ ইচ্ছামত সব কিছু হতে পারে। মিনি বিড়াল, বকনা বাছুর, নেড়ী কুকুর—সব, সব হতে পারে। রাতে ডেঙ্গুরে-জ্যাঠা আমাকে মঠে নিয়ে গেল। তুমি ত বাবা জান—মঠের গায়ে ওগুলো কি লেখা। স্বপ্নে একদিন লেখাগুলো আমায় বলে দাও না। উৎসবের দিনে তোমাকে মানত দেব। ওদের ত বলে দিলাম, আমি মাছের রাজা। ওদের কাছে তুমি আমার মুখ রেখ। তুমি আমায় মাছের রাজা করে দিও। শঙ্খিনী সাপ ধরে রেখেছি, এবার বাড়ি গিয়ে গলায় শঙ্খিনীর হাড়, দেখ ঠিক পরব।

নারাণ ভাবল সে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। অবশ্য কোনো ক্ষতি হয় নি, কারণ বঁড়শিতে কোনো খোঁট দেয় নি। সে একটু টান হয়ে নিল ফের। শেষে ফের উপুড় হয়ে পড়ল। লোকনাথ ব্রহ্মচারীর কাছে তার আর চাইবার কিছু নেই। তবে ওর কেমন যেন ইচ্ছে হল ডেঙ্গুরে-জ্যাঠার মত মরতে পারলে বেশ হত। যেখানে-সেখানে যাওয়া যেত, যেমন-তেমন রূপ ধরে জলে-স্থলে বিচরণ করা যেত। ডেঙ্গুরে-জ্যাঠা ইচ্ছে করলে এখন মেঘনার নীচে অনায়াসে মাছ হয়ে ঢাঁইনের ঝাঁকে মিশে যেতে পারে, আর বড় ঢাঁইন মাছটাকে পথ ভুলিয়ে ওর

বঁড়শিতে এনে ভিড়িয়ে দিতে পারে। জ্যাঠা, মনে রেখ তুমি আমায় খুব ভালবাসতে। তোমার চাঁই থেকে বড় বড় গলদা চিংড়ি চুরি করে খুসি ও শঙ্করী-বৌদিকে দিতাম। তুমি সব জানতে, অথচ কিছু বলতে না। কতটা ভালবাসলে এমন হয়! একি! আবার অন্যমনস্কতা! এগুলো ত ঠিক হচ্ছে না। এইমাত্র যদি খোঁট দিত? কি হত তবে? মাছটা ছুটে যেত—আফসোসের অন্ত থাকত না। হয়ত হারাণের মত স্বার্থপর ছেলে বঁড়শি হাত থেকে জোর করে নিয়ে নিত।—তুই মাছটা আটকাতে পারলি না, দে এবার বঁড়শিটা আমায় দে। আমি ধরি। মাছের অর্ধেকটা কিন্তু আমার।....কি বিশ্রী চিন্তা নারাণের! কেবল খাই-খাই ভাব। মধু-চাক ভাঙবার সময়, হারাণ চুরি করে মধুর ঘরগুলো বল্লাসহ মুখে পুরে দেবে। এমন রাক্ষস মানুষ হয়! হারাণ, তুই একটা মানুষ না রাক্ষস, স্বার্থপর! ভুলু, তুই বড় নিরীহ।···এ জগৎ-সংসারে এমন ভাবটি হলে ত চলবে না। তোমাকে সকলে ঠকাবে, তুমি ঠকবে। নারাণ ভাবল এমন একটি সুন্দর কথা সে শিখল কি করে! জগৎ-সংসার। ভুলুর বাবাকে মনে করতে পারল সে। 'জগৎ-সংসার' কথাটা তিনিই নারাণকে বলেছিলেন। অযথা নারাণ একবার ফড়িংয়ের লেজে একটা সুতো বেঁধে দিয়েছিল।—এ জগৎ-সংসারে এমন ভাবটি হলে চলবে না, ভুলুর বাবা বলেছিলেন। ভুলুর বাবা কদাচিত সম্মান্দী আসতেন। ভুলুর বাবার মুখের সঙ্গে ভুলুর মুখ মিলিয়ে দেখল নারাণ। অমন মানুষের অমন ছেলেই হয়! ভুলু, তুই এককালে খুব বড় হবি। আমি নারাণ, একথাটা মনে মনে বলে দিলাম।

নারাণ মেঘনার জলের সঙ্গে মুখ মিশিয়ে দিল। সে অন্যমনস্ক হতে আর চাইছে না। অনেক চেষ্টা করছে নিজেকে টোন-সুতার ওপর একাগ্রচিত্ত করতে। ও এতটা নুয়ে পড়েছে, মনে হয় যে নদীর সঙ্গে সে কানে কানে ফিসফিস করে কথা বলছে। মেঘনা নদীটা ওর কাছে এখন শঙ্করী-বৌদির মত। যেন শঙ্করী-বৌদির নাক, মুখ, চোখ। খুসির মত চঞ্চল। হেনার মত আবার খুব নিরীহ এবং ভাল মেয়ে।

নদীটা ওর কাছে এখন মেয়ে হয়ে গেছে।—কি গো মেয়ে,—সে যেন বলতে চাইল, তোমার বুকে এমন করে মাছকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, সে দেখে তোমার দয়াও হয় না। কাল এত মানুষ এত মাছ পেল, আমাদের দিকে তোমার একটুকু নজর হল না। এ কি তোমার উচিত হল! ভুলুর মত ভাল মানুষটা নৌকায় থাকতে তোমার নজর উঠছে না! একটা মাছ আমাদের দিয়ে দাও, তবেই আমরা ফিরে যাব। শুধু হাতে গেলে, ঈদা নিরঞ্জন তারা বলবে কি! বলবে, আমরা ছোটমানুষ—সে কথা শুনে তোমার ভাল লাগবে! ঈদা, কলিমদ্দি, আফাজদ্দি. এ কথাগুলোও ভাবল নারাণ। —ভুলু, নারাণ এবার কথা বলল, তুই আফাজদ্দিকে চিনিস?

—চিনি। আফাজদ্দি অমূল্যদাকে একবার কাছারিবাড়িতে মারতে গেছিল।

—আমার বাবাকেও আফাজদ্দি লোক দিয়ে মারবে বলেছিল, কিন্তু পারে নি। ঠোঁট উল্টাল নারাণ।—বাবার হাতেও কম লোক নেই। ঈদা কলিমদ্দি ওরা ত বাবার লোক। আফাজদ্দি একটা গোমুখ্যু মানুষ, সে আবার হবে ইউনিয়ানের প্রেসিডেণ্ট! আমার বাবা আগে আলিপুর হাটের সেরা মাছটা কিনত। এখন আফাজদ্দি কিনতে আরম্ভ করছে। হজ করে এসে মোল্লা হয়ে গেল। সেই মোল্লা সাহেবই আবার লোকলস্কর নিয়ে গাঙে মাছ ধরতে এসেছে। ওর নৌকায় ঈদা রয়েছে দেখলি?—বলে দূরের একটা নৌকা নারাণকে দেখিয়ে দিল।—বাবাকে গিয়ে বলব, আফাজদ্দির নৌকায় ঈদা আজকাল ঘুরঘুর করে। মাগনা ওষুধ বাবা ওকে আর খাওয়াবেখন।

ভুলু চোখ তুলে একবার নৌকাটা দেখল, কিন্তু কোনো কথা বলল না। ঈদা ওদের বাড়িতে কাজ করত। ভুলু এসেও ঈদাকে সম্মান্দীর বাড়িতে কাজ করতে দেখেছে। খুব ভালমানুষ, সরল মানুষ ঈদা। এখন আর সে কাজ করে না। ভুলু আসার কিছুদিন পর কাকীমা ঈদাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছেন। অবশ্য ঈদা এখনও সময় পেলে

একবার ঘুরে আসে। দেখে আসে হেনাকে। হেনাকে সে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে। একবার ঈশা, ভুলুকে (তখন ভুলু খুব ছোট টুকী-পিসির বিয়েতে খেতে এসেছিল সম্মান্দীর বাড়িতে) কাঁধে করে রাইনাদীর বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে গেছিল। তখন কার্তিক মাস। যাবার পথে ধানক্ষেতের আল থেকে অনেক কচ্ছপের ডিম সংগ্রহ করেছিল ধন-ঠারাণের জন্য। আলের মাটি দেখলে সে কি পারে কোন মাটির তলায় কচ্ছপের ডিম আছে, কোন মাটির নীচে ইঁদুর বাসা বেঁধেছে। সে সময় ঈশার মুখে দাড়ি ছিল না। এখন একগাল দাড়ি। ঈশা, কলিমদ্দি, আফাজদ্দি, হেফাজদ্দি সকলকে দেখতে একরকম এখন। তবু ঈশা ডাকল: রাঙ্গাঠাকুর, যাচ্ছ কোথা? ধন-ঠারাণ নাকি এয়েছেন? একবার দেখা করতে যাব।—সঙ্গে সঙ্গে ভুলুর চোখের ওপর সকলের মুখ ভাসতে থাকল। ঈশা, রনা, ধনা সব। রনা বলত, ধন-মাসীমা, রাইপুরার হিন্দুগেরাম জ্বালাইয়া দিছে। বড় জ্যেঠিমাকে বলত, বড়মামী।—বড়মামী, দেশে আর সুখ নাই। কোথাকার কতগুলান লোক আইসা দিল গেরামটারে পুড়াইয়া। অগ আপনেরা ইসলাম ভাইবেন না। অরা হিন্দু না, মুসলমান না, অগো জাত নাই। অরা কাফের। রনার চোখদুটো ছলছল করত তখন। রনাকে একদিন ভুলু কাঁদতে দেখছিল।—সোনামামা, আপনেরা এই দ্যাশ ছাইড়া যাইয়েন না। আমরা বাঁচলে আপনেগ পরান দিয়া বুক ঠেকাইয়া বাঁচামু। আল্লার কসম থাকল।—বলতে বলতে রনা কেঁদে দিয়েছিল। ঈশাও তেমন মানুষ। সেই ঈশা কেন যাবে আফাজদ্দির নৌকায়! ভুলুর মনে মনে হিংসা হচ্ছে।

ভুলুর রাগ হতে থাকল ঈশার ওপর। এবার পথে দেখা হলে কথা বলবে না, এও ভাবল। ঈশা আফাজদ্দির নৌকায় আছে, একবারও বলতে পারত, কি রাঙ্গাঠাকুর মাছ ধরতে আসলা? বাড়ির সকল মানুষ ভাল ত? কিন্তু কিছুই না বলে নৌকার পাটাতনে উপুড় হয়ে নমাজ পড়ছে। যেন ওদের একেবারে দেখতে পাচ্ছে না, অথবা দেখতে না পায় সেজন্যই। নারাণও ঈশার মত হয়ে আছে। যেন ঈশার

সঙ্গে নারাণের পাল্লা। ঈদাকে সে আজ দেখাবে, ছোটমানুষ বলে বড় গাঙ কম মান্যি করে না, কম মাছ দেয় না। ভুলু ডাকল, বাবা লোকনাথ, নারাণের বড় আশা, তুমি ওকে একটা মাছ দিও। শঙ্করী-বৌদি, খুসির কাছে নয়ত ওর মুখ থাকবে না। আর আমরা ছোটমানুষ বলে, ঈদা নিরঞ্জন ঠাট্টা করবে। বাড়ির লোকেরা না-বলে-কয়ে এসে[illegible] বকবে। নারাণের বাবা নারাণকে মারধোরও করতে পারে।

ভুলুর মনটা জলের মত বিস্তৃত হতে চাইল। জল যেমন নদী নালা খাল বিল ধরে সমুদ্রে হাজির হয়, ওর মনও অনেকগুলো চিন্তার স্রোত ধরে তেমন এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছতে চাইল। লণ্ঠনের আলোর পাশে ঈদার মুখ দেখতে পেল ভুলু। সেই শোলমাছের জোনাকি ধরে-খাওয়ার কথা ভাবল। ঈদার গল্প পাতাবাহারের বেড়ার ফাঁক ধরে পুকুরঘাটে নেমে যেতে চাইছে। ঈদা নড়েচড়ে যেন বসল। যেন হেনা, ভুলু এবং অন্যান্য [illegible] বাড়ির ছেলে ওকে ঘিরে রয়েছে। ভুলুর কাছে ঈদা আস্তানা পা[illegible]র মত। সেই ঈদা নাকি এখন অন্য দেশের মানুষ হয়ে যাচ্ছে। হেনাকে বলবে কথাটা, ভাবল ভুলু। সঙ্গে সঙ্গে হেনার পাণ্ডুর মুখটার কথা ভাবল। বাবা লোকনাথ, তুমি ওকে ভাল করে দা[illegible]। হেনার পাণ্ডুর মুখের সঙ্গে ভুলু তার বাবার ঈশ্বরের কথা ভাবতে পারছে; পাগল-জ্যাঠামশাইয়ের ঈশ্বরের কথা মনে পড়ছে। ওর মনে পাগল-জ্যাঠামশাইয়ের ঈশ্বর, বাবার ঈশ্বর আলাদা। কারণ বাবার ঈশ্বর বলেন, ভালমানুষকে তিনি দুঃখ দেন না। পাগল-জ্যাঠামশাই ত খুব ভালমানুষ। তিনি এত দুঃখ পেলেন কেন! পাগল-জ্যাঠামশাইয়ের ঈশ্বর ভালমানুষকেই হয়ত দুঃখ দেন। খারাপ মানুষকে ভয়ে কিছু বলেন না। নয়ত আক্কাজদ্দি একটা গুণ্ডা ধরনের মানুষ, হয়ত অমূল্যদা প্রেসিডেন্ট হল, সে হতে পারল না, সেজন্য রাগ করে অমূল্যদাকে মারতে যাওয়ার কি আছে। কিন্তু এবার ত ভুলু শুনতে পায় আক্কাজদ্দির পক্ষেই নাকি বেশী লোক।

ভগবান এবার আফাজদ্দির পক্ষেই কথা বলেছেন। ভুলুর এইজন্যই মনে হল আলাদা আলাদা মানুষের ভিন্ন ভিন্ন ভগবান এবং তারা আলাদা আলাদা শক্তির অধিকারী। হেনার ঈশ্বরের কথাই বলি, তুমি কেমনতর মানুষ! হেনার মত এমন নিরীহ মেয়েটাকে কষ্ট দিচ্ছ। হেনা দুবেলা শুধু তোমার কথাই বলে। হেনা ত আমার চেয়ে তোমাকে বেশী ভালবাসে, অথচ তাকেই তুমি দুঃখ দাও। অসুখ ওর কিছুতেই সারছে না। ভুলুকে এখন দেখে মনে হচ্ছে, ঈশ্বর লোকটাকে জলের তলায় খুঁজে বেড়াচ্ছে যেন সে। হেনার ঈশ্বরকে দুটো রাগের কথা বলবে।

দুটো শব্দ এল দুটো নৌকা থেকে। একটি শব্দ 'চাঁইন', আরো একটি শব্দ 'নৌকা ডুবে গেছে'। ঘূর্ণির মুখে পড়ে একটা নৌকা ডুবে গেল! ছোট কোষা নৌকা ঘূর্ণির পাক সহ্য করতে পারে নি। কটা লোক ডুবল? তিনটে। নৌকায় নৌকায় হৈ-চৈ হচ্ছে। সতর্ক হচ্ছে সকলে। ঘূর্ণি দেখে নৌকার হাল ঘুরাল মাঝিরা। হারাণও সতর্ক হল। ভুলু বলছে, ভয় নেই বাবা লোকনাথের নাম করবি। ঘূর্ণি দেখে হাল ধরবি। এতগুলো নৌকার ভিতর একটি নৌকা এতক্ষণে চাঁইন ধরল। ঈদার নৌকা কিনা ভুলু হারাণ ঘাড় তুলে দেখার চেষ্টা করল। না, ওটা ঈদা, আফাজদ্দির নৌকা নয়, অন্য নৌকা। আফাজদ্দির নৌকায় ছই আছে। অন্যান্য নৌকায় ছই নেই। চাঁইন মাছ ছই না-দেওয়া নৌকায় ধরা পড়েছে।

ওদের নৌকা ভাটার মুখে নামছে, যেন একটা কচ্ছপ ভয় পেয়ে জলের দিকে ছুটছে। ওদের নৌকাটাও খুব ছোট। এ-নৌকাও ডুবতে পারে। আফাজদ্দির নৌকা কিন্তু ডুববে না। ওর তিনজন সাই-জোয়ান মাঝি রয়েছে। হালের মাঝি আরো জোয়ান। মেঘনার ঘূর্ণির ক্ষমতা কি সে নৌকা ডুবায়? হারাণের ইচ্ছা হল আফাজদ্দির নৌকায় উঠে যেতে। ঈদা কাছে থাকলে গোপনে কথাটা বলা যেত, তোমাদের নৌকায় থাকব, দাঁড় টানব, বঁড়শি ফেলব। মাছ পেলে সমান সমান ভাগ। তার চেয়ে বড় কথা জীবন নিয়ে টানাটানি হবে

না। মাছও হবে, জীবনও বাঁচবে। এ-নৌকায় মাছও হবে না, জীবনও বাঁচবে না।

নারাণ হঠাৎ জলের ওপর ঝুঁকে মুখটা জলের সঙ্গে মিশিয়ে দিল। বঁড়শিতে ছোট বড় দুটো টান দিয়ে উঠে বসল নৌকার পাটাতনে। একটি সংশয়ের দৃষ্টি নিয়ে হারাণের দিকে চাইল। যেন বলতে চাইল, হারাণ ঠিক থাকবি, টোনসুতো খুব ভারি ঠেকছে। নারাণ টেনে তুলতে পারছে না বঁড়শিটা। অথচ সে আশ্চর্য হল বঁড়শিটা হ্যাঁচকা টান খাচ্ছে না, মাছটাকে মনে হচ্ছে খুব নিরীহ, নারাণের বঁড়শিতে মাছটা যেন ইচ্ছা করে আত্মহত্যা করতে আসছে। ভুলুর এমন উত্তেজনা হচ্ছিল যে সে কথা বলতে পারছে না। হারাণ হাল থেকে উঠতে পারছে না পাছে নৌকা ঘূর্ণির ভিতর গিয়ে পড়ে। নারাণও 'টাইন আটকে গেছে' বলে চিৎকার দিতে পারছিল না, কারণ যে মাছটা আত্মহত্যা করতে আসছে, কোনো টান-টোন না দিয়ে নিরীহভাবে উঠে আসছে—সে মাছ ধরে আর কতটা কৃতিত্ব আর কতটা উত্তেজনা থাকতে পারে!

সে চেয়েছিল মাছটা উত্তর দক্ষিণে পূবে পশ্চিমে যেদিকে খুশি সেদিকে ছুটুক। মাছটা আফাজদ্দির নৌকার সামনে দিয়ে ওদের নৌকাটাকে টেনে নিয়ে যাক। ঈদা দেখুক ছোটমানুষ বড় মাছ ধরেছে। অথবা মাছটা পিট ভাসিয়ে লেজ তুলুক আকাশে। বাদামের মত নৌকা টেনে চলুক। কিন্তু তার কিছুই করল না। মাছটা যেন হাতজোড় করে আসছে। নৌকায় তুলে তোমরা আমাকে কৃতার্থ কর, এমন ভাব। নারাণ আবার ভাবল, মাছটার মাথায় কোনো দুষ্টুবুদ্ধি খেলছে না ত! জলের ওপর ভেসে ওঠার আগে কোনো বদ-মতলব থাকতে পারে। হঠাৎ খুব হ্যাঁচকা টান দিতে পারে। হাত কাটতে পারে টোনসুতোর ধারে। সে বুদ্ধি করে একটা গামছা হাতের চারিদিকে পেঁচিয়ে নিল, যাতে মাছটার বদ-মতলব থাকলেও নারাণের কোনো ক্ষতি করতে না পারে। কিন্তু যদি মাছটা টাইনের রাজা হয়? স্বপ্নে-দেখা মাছটার মত প্রকাণ্ড হয়? হয়ত

সন্তর্পণে মাছটা ঠিক নৌকার নীচ ধরে উঠে আসছে, কেননা মনে হল টোনসুতোর শেষপ্রান্তটা নৌকার নীচ থেকেই উঠে আসছে। নারাণকে খুব চিন্তিত দেখাল। মাছটা হঠাৎ ভেসে যদি নৌকাটা কাত করে দেয় অথবা খোলটা চিরে দেয়—কতরকমের মতলবই আঁটতে পারে। নারাণ একটা লাঠি কি ভেবে নৌকার নীচে ঢুকিয়ে দিল। ভুলুকে বলল লাঠিটা ধরে রাখতে। আবার সে টোনসুতো টানতে থাকল।

ভুলু এবার চিৎকার না দিয়ে থাকতে পারল না। সে ভেবেছে বঁড়শির অধিকাংশ সুতো যখন পাটাতনে উঠে এসেছে, তখন মাছ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত। এখন চিৎকার করলে গতকালের মত আর লজ্জায় পড়তে হবে না। সে গলা ছেড়ে বলল, ঢাঁইন! ঢাঁইন!!—অন্যান্য নৌকাগুলো সে খবর পেয়ে সামনের পথ ছেড়ে দিল নিজেরা সরে গিয়ে। ওরা ঘাড় তুলল, ঘাড় বাঁকিয়ে দেখল। হারাণের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে উত্তেজনায়। ভুলুকে একবার বলতে ইচ্ছে হল, ভুলু হাল ধর, দেখি কেমন মাছ? কতবড় মাছ। কিন্তু ততক্ষণে নারাণ বলেছে ছিঃ ছিঃ সর্বনাশ হল!

ভুলু দেখল। দেখতে দেখতে সে চোখদুটো প্রায় স্থির করে দিল।

হারাণ দেখল, দেখতে দেখতে ওর চোখদুটো ঘোলা হয়ে উঠল। হারাণের হাল ছেড়ে পাটাতনের ওপর গড়িয়ে পড়ার উপক্রম হল। নারাণ সুতোটা শক্ত করে ধরেই ধমক দিল, এই ভুলু, জলদি হালে যা। দেখ হারাণটা ভিরমি খেল। নারাণ এবার অত্যন্ত সহজ হয়ে অন্যান্য নৌকাগুলোর দিকে হাত তুলে দিল। ডাকল—নৌকাডুবির একটা মানুষ আমার বঁড়শিতে প্যাঁচ খেয়ে আটকে গেছে। আপনারা আসুন, মানুষটাকে ধরে তুলি।

নারাণের এই আত্মপ্রত্যয় দেখে ভুলুও খুব সহজ হয়ে গেল। সে উঠে দাঁড়াল। হারাণকে একপাশে সরিয়ে রেখে শক্ত হাতে হাল ধরল। এবার সে ভাল করে দেখল মানুষটাকে। মানুষটার চুলগুলো খাটো, লম্বা ছাঁটা দাড়ি। ছিটের জামা গায়। লুঙ্গী পরনে। জলের ওপর কখনও উবু হয়ে, কখনও চিত হয়ে ভাসছে! সুতোটা প্যাঁচ

খেয়ে খেয়ে সমস্ত শরীর প্রায় জড়িয়ে ধরেছে। চোখগুলো বড় বড়। চোখ দিয়ে প্রাণটা বেরিয়ে গেছে হয়ত।

অন্যান্য নৌকাগুলো পাশে এসে ভিড়ল। ওদের নৌকার পাশ থেকে মানুষটাকে তুলে দেওয়া হয়েছে তীরে! বাজারের দিকটায় কোলাহল উঠেছে। গ্রামের ভিতর থেকে অনেক লোক ছুটে এল। মরা মানুষটাকে দেখল আর বলল, এমন ঘটনা প্রতিবারই ঘটছে। তবু মানুষগুলোর মাছের নেশা গেল না।—হারাণ কথাগুলো শুনতে পেল। সে এখন একটু সুস্থ বোধ করছে। সে বেঁকে বসল। বলল, নারাণ, আমাকে তোরা নামিয়ে দে। বৈদ্যেরবাজার থেকে আমি সাঁতরে বাড়ি ফিরব। মেঘনায় চাঁইন মাছ ধরার শখ আর নেই আমার। অনেক দেখিয়েছিস, আর না!

নারাণ কোনো কথা বলল না। শুধু একবার চোখ তুলে তাকাল হারাণের দিকে। চোখদুটোতে নারাণের বিরাট নৈরাশ্য। নারাণ নিজে যেন বুঝতে পারছে চাঁইন মাছ ওদের নৌকায় আটকাবে না। ভুলুর দিকে চেয়ে ওর মনের ভাবটা জানার চেষ্টা করল। কি ভেবে বলল, হারাণ যখন নেমে যেতে চায়, নামিয়েই দিই।

হারাণ গলুইয়ে উঠে বসল। ভুলু হাল ধরে নৌকার মুখ ঘুরিয়ে দিল। বাজারের দিকে নৌকাটা চলেছে। হারাণকে বাজারে নামিয়ে দেওয়া হবে।

নারাণ ভুলুকে বিভিন্নভাবে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করছে। হারাণের মত ভুলুর মনও যদি বিগড়ে বসে তবে ওর আর কোনো অবলম্বনই থাকবে না। সে বলল, তুই শুধু হালে বসে থাকবি ভুলু, আর তোকে কোনো কাজ করতে হবে না! দামোদরদীতে নৌকা উজান বেয়ে আমি নেব। হারাণ থাকলে দু ঘণ্টায় হত, আমি একা না হয় চার ঘণ্টা দাঁড় টানব। আর দুটো উজান যে ভাবে হোক পাড়ি দেব। আজ দিনটা দেখব, তাতে শরীরের যা ক্ষতি হয় হবে।

বাজারের ঘাটে নৌকা লাগানো হল কিন্তু হারাণ নামছে না। অথবা নামার কোনো লক্ষণও প্রকাশ করছে না। নারাণ বাধ্য হয়ে

বলল, কি রে নাম! সব নৌকাগুলো উজান ধরে ওপরে উঠে যাচ্ছে, আমাদের এখানে বসে থাকলে চলবে? তা ছাড়া আমি একা নৌকা বাইব, সেটা খেয়াল আছে? ওদের দু ভাটায় আমার এক ভাটা হবে।

হারাণ দাঁত ঘষে ঘষে বলল, নাম, নাম! নাম! যেন নামলেই হল। আমাকে তেনারা নামিয়ে দিয়ে রক্ষা পান। আমি সন্মান্দী যাই কি করে?

—সাঁতরে যাবি বললি যে!

—ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে মানুষ সাঁতরাতে পারে? হাত পা তবে সব ধানের পাতায় কেটে যাবে না!

—তবে বাজারে গিয়ে বসে থাক। সন্ধ্যের সময় আমরা নিয়ে যাব।—ভুলু হারাণকে অন্যপথের সন্ধান দিল।

—এতক্ষণ আমি চুপচাপ বসে থাকব বাজারে! আর তোরা খুব মজা করবি নৌকাতে, নদীতে। আমি খাব কি?—খাওয়ার প্রশ্নটাই হারাণকে বেশী চিন্তিত করে তুলল। নারাণ দু আনা পয়সা দিল হারাণকে। হারাণ যেন এই দু আনা পয়সায় চিঁড়ে গুড় কিনে খায়। রাতে যদি রান্না হয়, তবে ভাত খেতে পাবে। এ-কথাটাও হারাণকে জানানো হল।

হারাণ তবু চুপচাপ বসে থাকল। দু পা ছড়িয়ে পাটাতনে বসে থাকল। ওঠবার কোনো নাম নেই। নারাণ মনে মনে বিরক্ত হচ্ছে। বলবে নাকি আবার: এই টুসটুসীর বাচ্চা! পাটাতন থেকে নামবি ত নাম, তা না হয় দেব ধাক্কা মেরে জলে ফেলে! আমি কি তোমার বিবি!—ভুলু নারাণের চোখ দেখে বুঝতে পারল সে খুব বিরক্ত হচ্ছে। দামোদরদীর মঠের নীচের মত, সাপটা চাঁই থেকে খুলে ফেলার মত।

সাপটা বুঝি তখন ওদের কথাগুলো শুনছিল পাটাতনের নীচ থেকে। কারণ পাটাতনের নীচে শব্দ হচ্ছে না। সাপটা চুপিসাড়ে কিংবা আড়ি পেতে নিশ্চয়ই ওদের কথা শুনছে।

সাপটা এখন গড়িয়ে গড়িয়ে এক গুড়ার নীচ থেকে অন্য গুড়ার নীচে যাচ্ছে। চাঁইয়ের মুখটা গতকাল ভাল করে বেঁধে রাখতে ভুলে

গেছিল নারাণ। সে ঘটনার কথা তিনজন এখন একেবারেই ভুলে আছে। সাপটা এখন ঠিক হারাণের নীচে। পাটাতনের ফাঁক দিয়ে জিভ বের করবার চেষ্টা করছিল। অথবা ওদের কথা আগ্রহের সঙ্গে শোনার চেষ্টা করছে। ওদের কথা কিছু বুঝতে না পেরে সাপটা এখন চলেছে নারাণের দিকে। সে-গলুইয়ে ছোট একটা পথ রয়েছে ওপরে ওঠার। সাপটা সে-খবর অনেকক্ষণ আগেই নিয়েছে। কিন্তু নারাণ ওখানে বসে আছে সব সময়। নারাণের প্যান্টের স্পর্শটা জিভ দিয়ে অনেকবারই শঙ্খিনী গ্রহণ করেছে। তারপর বিরক্ত হয়ে ব্যর্থ হয়ে গুড়ার নীচে পড়ে থেকেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সে পালাবার পথ খুঁজছে অথবা যে মানুষটা ওকে ধরে এতটা দুঃখ দিচ্ছে, বিষদাঁতে লেজ নেড়ে নেড়ে ছোবল জমাচ্ছে তার জন্য।

হারাণ ফের কথা না বাড়িয়ে দাঁড়ে বসে পড়ল। দাঁড়টা জলে ফেলে নারাণের দিকে চেয়ে জোরে চাপী মারল। ভুলু ব্যাপারটা বুঝে হাল ঘুরিয়ে নৌকার মুখ ফেরাল। ওরা আবার উজানে চলেছে। ওরা তিনজন আবার নীল আকাশ, কালো গাঙ দেখে খুশী হয়েছে।

রোদ চড়েছে বলে ভুলু মাথায় মুখে জল দিতে থাকল। নারাণ জল তুলে দাঁড়ের কাঠে দিল। দাঁড়-টানার শব্দটা কানে বাজছে। জল-দেওয়ায় শব্দটা কমে গেল। ওরা ঘামতে শুরু করেছে। গত-কালের মত মুখ ফের লাল হতে শুরু করেছে। ওরা উঠছে, বসছে। উজানে নৌকা ঠেলছে। জলের ঘূর্ণি ওরা দেখল না; জলের ঘূর্ণি সম্বন্ধে ওরা কিছু ভাবল না। সে সব ভাবনার ভার ভুলুকে দেওয়া হয়েছে। নৌকা ডুবলে এখন ভুলুর দোষ।

আফাজদ্দির নৌকা খুব ওপরে গেছে। ওরা অনেকক্ষণ থেকে জোড়ে দাঁড় ফেলছিল আফাজদ্দির নৌকার কাছাকাছি যাওয়ার জন্য। কিন্তু নৌকাটাকে ওরা ধরতে পারল না। হারাণ রেগে গিয়ে বলল, শেখ জাতকে বিশ্বাস নেই।

ভুরু কুঁচকে নারাণ হারাণকে দেখল।—একথা বললি কেন তুই ?

—ওরা সব সময় নিজের জাতের কথাই বলবে।

—নিজের জাতের কথা না বলে তোর আর আমার কথা বলবে ?

—ঈদা এ-নৌকায় থাকলে ত পারত ! ভুলুর খুব আপনার লোক ত ঈদা ! কৈ সে-ঈদা ত এ-নৌকায় থাকল না।

নারাণ এতক্ষণে বুঝতে পারল হারাণ এমন সব কথা বলছে কেন। —এ নৌকায় থাকে নি, ওর ইচ্ছে নেই থাকার। তা ছাড়া আসবার সময় আমরা কি ওর ঘাটে নৌকা ভিড়িয়েছিলাম !

—ওর ঘাটে নৌকা ভিড়ালেও সে আসত না।

—সে আমি তোর চেয়ে ভাল জানি ! ঈদা এখন লীগের পাণ্ডা। (লীগ কথাটা নারাণ প্রথম কাছারি-বাড়িতে মাদারগাছের ডালে একটা কাগজের বুকে ঝুলতে দেখেছিল) এ দেশটা ওরা ওদের নামে ইংরেজদের কাছ থেকে লিখিয়ে নেবে। এই নিয়ে ওরা খুব হৈ চৈ করছে, বাবার কাছে পর্যন্ত যাচ্ছে না।

কথাগুলো শুনে ভুলু খুব বিষণ্ণ বোধ করল। নারাণকে প্রশ্ন করল, আমাদের থাকতে দেবে না এ দেশে ? কিন্তু হারাণ নারাণকে উত্তর দিতে না দেখে ভাবল ঈদাকেই বলবে কথাটা। পথে দেখা হলে কথা বলবে না ভেবেছিল, কিন্তু একবার অন্তত কথা বলতেই হবে। —ঈদা, তুই তোর দেশে আমাদের থাকতে দিবিনে ? ভুলু ভিতরে ভিতরে রেগে গেল। এ-কেমনতর কথা ! দেশটা স্বাধীন হবে কবে থেকে সে শুনে আসছে. কিন্তু সেই দেশটা যদি ঈদা আকাজদ্দি নিজেদের নামে লেখাপড়া করিয়ে নেয় তবে কেমন হবে। সে তার বাবার ভালমানুষটাকে মনে মনে গাল দিতে থাকল—বাবা জ্যাঠা-মশাই তারা সব জমিদারী সেরেস্তায় বসে বসে করছেন কি ! ওঁরা আর্জি পেশ করতে পারলেন না ! সে মনে মনে এখন তার ভগবানকে ডাকছে।—ভগবান, তুমি ঈদাকে টাইন মাছ দিও না। ঈদা স্বার্থপর হয়ে গেছে। এই কথাগুলো সে তার ভগবানকে জানিয়ে দেখল দুটো নৌকার ব্যবধান শুধু বাড়ছেই। ঠিক সেই মুহূর্তে ভুলুর মনকে বেশী নাড়া দিল পরের অনিষ্ট-চিন্তা করতে নেই কথাটা। সবই বাবা-জ্যাঠা-মশাইয়ের কথা। সুতরাং ঈদা টাইন ধরুক, পরের অনিষ্ট-চিন্তা করলে

নিজের. অনিষ্ট হয়। সুতরাং ঈদা টাইন মাছ না-পাক তেমন চিন্তা সে আর করবে না। ঈদা টাইন ধরবে, প্রতি বছরের মত এবারেও টাইন পাবে, এইসব কথাগুলোও সে যেন তার ভগবানকেই শোনাল। ভুলুর ভগবান চান না তাঁর মানুষেরা অন্যের অনিষ্ট-চিন্তা করুক। সে যেন ভগবানের কাছে মাফ চাইল। কিন্তু পৃথিবীর সব মানুষ-গুলোই যেন যে-যার নিজের অনিষ্ট-চিন্তা করছে। সে তাদের হয়ে মাপ চাইল। সে তার রাইনাদীর বাড়ির কথা ভাবল। সোনা-জ্যাঠামশাইকে ভাবল। কালে-ভদ্রে সোনা-জ্যাঠামশাই মুড়াপাড়ার জমিদারী সেরেস্তা থেকে বাড়ি ফিরতেন। মুড়াপাড়ার স্টিমার আসে বলে পৃথিবীর সব খবর সেখানে জমা হয়। জ্যাঠামশাইকে দেখে ভুলুর মনে হত, তিনি খবরের জাহাজ। আর তিনি যা বলতেন সব চন্দ্র-সূর্যের মত সত্য। ঘরে একটা হ্যারিকেন জ্বলত। তক্তপোষের ওপর তিনি পা গুটিয়ে বসতেন। আশেপাশের বাড়ির সব ছোট ছেলেরা বসে থাকত। তিনি বাড়ি এলে সকলের সেদিন পড়াশোনা থেকে ছুটি। গাঁয়ের অনেক লোক জড়ো হত দাওয়ায়। খবরের জাহাজ থেকে তখন খবর নামানো হত। তিনি কথা শেষ করেই বলতেন—ঘোর কলিকাল, এসে গেল। দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়ে গেল। চালের দাম যাট টাকা জীবনেও শুনি নি বাপু। সব দুর্ভিক্ষ, মহামারীতে মরবে। মানুষ আর একটাও বাঁচবে না। দেশের যা অবস্থা, বুঝে শুনেই ঠাকুর পটল তুলেছেন। ঠাকুর! কোন ঠাকুর! অনেকদিন পর ভুলু বুঝতে পেরেছিল জ্যাঠামশাই রবি ঠাকুরের কথা বলেছিলেন। দাঙ্গা আরম্ভ হয়েছে ঢাকায়। হিন্দু মুসলমানকে মারছে, মুসলমান হিন্দুকে মারছে। কেন মারধোর করছে ওরা! রনা, ধনা, আফাজদ্দি ওরা শুনে ত দীর্ঘশ্বাস ফেলত। ওরা ত বললে না, আসুন আমরাও খুনাখুনি করি। কিন্তু এখন যেন ভুলু সব স্পষ্ট বুঝতে পারছে। ঈদা অন্য নৌকায় গেল, আফাজদ্দির নৌকায়। হয়ত এতদিন পর ঢাকার সেই মানুষগুলোর চিন্তা গাঁয়ে গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। ওরা ওদের জন্য আলাদা দেশ চায়।

॥ পাঁচ ॥

সোনা-জ্যাঠামশাই বাড়ি থেকে চলে গেলেই ভুলুর মন খারাপ করত। যেমন এখন ভুলুর মন খারাপ করছে ঈদাকে আফাজদ্দির নৌকায় দেখে। জ্যাঠামশাই চলে গেলে ওঁর কথাগুলো বার বার মনে পড়ত—মড়ক, দুর্ভিক্ষ, ঝড়। ধরণী আর মানুষের ভার সহ্য করতে পারছে না। ধরণী দ্বিধা হবে। ভুলু তখন দেখতে পেত মানুষগুলো যেন সব খাদের নীচে পড়ে চাপা পড়ছে। এখনও তেমনি একটি ছবি ওর চোখের ওপর ভেসে উঠছে। খাদের ভিতর যারা চাপা পড়ছে তাদের ভিতর সে নিজেকে দেখতে পেল। পাশে হেনার মুখটা চেপ্টা হচ্ছে। খাদের মুখটা বুজে যাচ্ছে আর সেখানে একটি মাত্র মুখ, হেনার মুখ খাদ থেকে ধীরে ধীরে উঠে আসছে। তারপর মুখটা চোখের ওপর কিছুক্ষণ কেঁপে রোদের ভাঁজে মিলিয়ে গেল। ভুলু চোখের পলকে সব দেখল। প্রলয়ে পৃথিবী ধ্বংস হচ্ছে। একমাত্র একটি নৌকা, একটি নিশান আর একটি মানুষ বেঁচে আছে। সে আফাজদ্দি, ওর নৌকা আর লগিটা। ভুলুর ভগবানকে আফাজদ্দি নৌকার পাটাতনের নীচে যেন আবদ্ধ করে রেখেছে।

—এই গেল গেল!— হারাণ, নারাণ দুজনেই বৈঠা জলের অনেক নীচে ঢুকিয়ে চিৎকার তুলল। ভুলু এবারেও চোখের পলকে দেখল একটা ঘূর্ণি নৌকাটাকে টানছে। সে অন্যমনস্ক হয়ে এমন কাণ্ড বাঁধিয়েছে। পলকের ভিতরই সে হালটা ঘুরিয়ে নিল। নৌকা ঘূর্ণি বাঁয়ে রেখে আবার উঠতে থাকল ওপরে।

হারাণ বলল, মনটা কোথায় রেখে দিস বলত ?

ভুলু উত্তর করল না। ওর হয়ে নারাণই উত্তর করল, মনটা ও আকাশে রেখে দেয়। মাঝে মাঝে তোর আর আমার জন্য সে ওটাকে পেড়ে আনে।

ভুলু ভাবল বিদ্রূপ করছে নারাণ। নারাণ বিদ্রূপ করিস না, মন আমার ভাল নেই। ঠাট্টা করে মেজাজটাকে আর বিগড়ে দিস না। ভুলু তীরের দুটো জলপাইগাছ দেখতে থাকল। কচি কচি জলপাই হয়ত গাছটাতে ধরেছে। কার্তিক মাসে মা কার্তিক পুজোর ঘটে জলপাই দেন। ভুলুর নিজের ওপর খুব রাগ হতে থাকল। কি সব আজগুবী চিন্তা মনের ভিতর সে ঠাঁই দেয়। এক চিন্তা থেকে অন্য চিন্তায় কে যে ওকে ধরে নিয়ে যায়! সে এই বয়সে এমন সব কল্পনা করতে কি করে যে শিখল, আর এমন অন্যমনস্কতাই বা গড়ে উঠল কি করে! ভগবানকে কি কেউ আবদ্ধ রাখতে পারে?

—মন খারাপ কেন? তুই ও হারাণের মত বাড়ি চলে যেতে চাস। বাড়ির জন্য মন কেমন করছে?

ভুলু তখন কোনো উত্তর করল না। শঙ্খিনী তখন এক গুড়ার নীচে থেকে অন্য গুড়ার নীচে পাক খেয়ে চলেছে। নারাণ তার সে জায়গা ছেড়ে উঠল না। সুতরাং ফাঁকটা আবদ্ধই আছে। শঙ্খিনী যখন ভুলুর নীচে এসে থামল, সে সময় দেখল যে একটা হাত অন্য পাটাতনের নীচে কিছু খুঁজছে—কলাই-করা থালা অথবা অন্য কিছু। শঙ্খিনী গুঁড়ি গুঁড়ি না চলে সে তার দুমুখ একসঙ্গে ধরল, তারপর লাফ দিয়ে কামড়াতে চাইল হাতটাকে। লাফ দিতে দুটো মুখই বার বার গুড়ার ওপর আছাড় খেল। শঙ্খিনীর আক্রোস কমছে না। আছাড় খেয়ে খেয়ে শিথিল হচ্ছে মেরুদণ্ডটা! আছাড় খেয়ে মুখ থেকে রক্ত ঝরল। সাপটা ক্লান্ত হয়েছে। হাতটাকে সে কিছুতেই ছোবল দিতে পারল না। ভাঙা পিঠ নিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে কোনোরকমে আবার নারাণের দিকে চলল। ততক্ষণ হাতটা উঠে গেছে। পাটাতনের কাঠ পড়ার শব্দ শুনতে পেল।

নারাণ পাটাতনের নীচে হাত দিয়ে যখন দেখল তলায় জল জমে নেই তখন পাটাতনের কাঠ ফেলে দিয়ে ফের দাঁড় টানতে থাকল। নৌকা টানতে খুব কষ্ট হচ্ছে, জলে নৌকা ভারি লাগছে না, শরীরই ক্রমশ ভারি হয়ে উঠছে। হাতের শক্ত কড়গুলোতে পর্যন্ত ফোস্কা

পড়তে শুরু করেছে। ভুলুকে আর কিছু বলতে ইচ্ছে হল না। কোনোরকমে দামোদরদীর ঘাটে নৌকা পেঁছানো নিয়ে কথা। কিছু কিছু মাছ ধরার নৌকা ওদের সঙ্গে এখনও নদীতে পড়ে রয়েছে। ওরাও কালকের মানুষ, বৈদ্যেরবাজারে নিশ্চয়ই রাত কাটিয়েছে। কালকে টাঁইন আটকাতে না পেরে ভুলু-নারাণের মত আজকের জন্য প্রতীক্ষা করছে। হয়ত কালতকও করবে। টাঁইন মাছের জো তিনদিনের বেশী থাকে না। কালতক না মিললে বিশমিল্লা করে এ-বছরের মত ক্ষেমা দিতে হবে। আল্লা আল্লা করে গুড়ায় বাদাম দিয়ে ঘরমুখো রওনা হতে হবে।

চুপচাপ বসে থাকলেই অন্যমনস্কতা বাড়ে। এবং হালে বসে থাকলেই চুপচাপ বসে থাকতে হয়। ভুলু সেইজন্যে বলল, তোরা একজন এসে হাল ধর, আমি দাঁড় টানি।

হারাণ প্রায় ছুটে এসেই হালটা ধরল। ভুলু হারাণের দাঁড়ে গিয়ে বসল। নারাণকে উদ্দেশ করে বলল, একসঙ্গে বৈঠা ফেল। সঙ্গে গান ধর।

—কোন গান ধরব ?

—যে কোনো গান, যা তোর মনে আসে।

নারাণ এই মুহূর্তে কোনো গান মনে করতে পারল না। কোনো গান তার মনে আসছে না। কোনো গানের কলি। সে ত অনেক গান জানে। এমন কেন হল ! ভুলুর দিকে চাইল নারাণ।—কোনো গান মনে পড়ছে না ভুলু।

—বলিস কি ! এত গান জানিস আর একটা গানও মনে পড়ছে না ? তুই মিথ্যা কথা বলছিস ! তোর গান গাইতে ইচ্ছে করছে না। চড়া রোদে গান তোর ভাল লাগে না।

ভুলু হয়ত সত্যি কথাই বলেছে। এই রাতদিন পরিশ্রমে ওর সব ভুল হয়ে গেছে। অথবা ভুলতে চেষ্টা করছে। অথবা টাঁইন মাছটা ওর জীবনের সব আশা আকাঙ্ক্ষার কথা ভুলিয়ে দিতে চাইছে। তবু ভুলুর ধারণাটা পাল্টে দেবার জন্যই যেন নারাণ উঠে পড়ে একটা

গানের কলিকে খুঁজে পেল। সে হাসল। নৌকাটা চলেছে, বৈঠা পড়ছে ছপ ছপ। নারাণ গান ধরেছে তখন,—কলকাতা কেবল ভুলে ভরা বুদ্ধিমানে চুরি করে, বোকায় পড়ে ধরা···ও ভাই কলকাতা যে কেবল ভুলে ভরা।

ভুলু হাসল। হারাণও গান শুনে হাসল। নারাণ গান শেষ করে বলল, কলকাতার মানুষগুলো কেমন দেখতে ইচ্ছে হয়। বাবা কেবল কলকাতা কলকাতা করেন। আফাজদ্দি তারা আমাদের দেশটাকে নিয়ে নিলে বাবা বলেছেন কলকাতায় চলে যাবেন। আমি কিন্তু যাব না ভুলু। কলকাতায় গেলে মাছের রাজা হওয়া যায় না।

॥ ছয় ॥

এক ঝাঁক জালালী কবুতর নদীর ওপর অনেকক্ষণ ধরে উড়ছে। উড়ে উড়ে ইচ্ছা করে ক্লান্ত হচ্ছে। নদীর বুক ঘেঁষে ওরা এবার তীরে উড়ে গেল। মঠের কার্নিশে গিয়ে বসল। গোপালদী থেকে রাতের স্টিমারটা ফিরছে। দু-তিনটে ঘাসী-নাও ধান কাটতে রওনা হয়েছে উজানে। লোকগুলো পাটাতনে বসে হল্লা করছে। দামোদরদীর হাটে একটা মানুষও দেখা যাচ্ছে না। এখানে যে গতকাল আনারস-কাঁঠালের নৌকার ভিড় ছিল, এখন দেখলে সে-কথা কে আর বিশ্বাস করবে। দুটো-একটা নৌকা খাল বিল ধরে নদীতে পড়ছে। নদীর কিনার ধরে বঁড়শি নাচিয়ে বেলে-চিংড়ি ধরছে তারা। দুটো ফিঙে জলের ওপর বসে আবার উড়ে যাচ্ছে। ওরা নারাণ-হারাণদের নৌকার দিকে ক্রমশ এগিয়ে আসছে। স্রোতের টানে একটা পোকা নীচে এসে নামছে। সেটা ধরে খাওয়ার শখ ফিঙে দুটোর। নারাণ বৈঠা দিয়ে জোরে একটা বাড়ি মারল জলে। ফিঙে দুটো ভয়ে আর এদিকে এল না। পোকা-মাকড়সা ঢেউয়ের বাড়িতে জলের তলায় হারিয়ে গেল।

ভাদ্রমাসের রোদ। এ রোদে তাল পাকে। এ-রোদে জল থেকে আগুনের ভাপ ওঠে। ওরা গরমে ছটফট করছিল। সমস্ত শরীর ওদের পুড়ে যাচ্ছে। ওরা ভাবল স্নান করবে। নারাণ হাল ছাড়ল না। ও হালে বসে থাকল। ভুলু আর হারাণ নদীর জলে লাফ দিয়ে নৌকাটা ধরেই দু-তিনটে ডুব দিয়ে উঠে পড়ল। এবার ভুলু হাল ধরল। নারাণ জলে নেমে সাঁতরে সাঁতরে স্নান করল।

দামোদরদী পৌঁছতে প্রায় দুপুর হয়ে গেছে। এবার ওরা বঁড়শি ফেলবার সময় কার্তিকে স্মরণ করল না। অথবা ভগবানকে মনে করতে পারল না। অথবা বঁড়শি নদীর জলে ছোঁড়বার সময় দেবতার নাম

স্মরণ করতে হয়, সেই নিয়মটাই ভুলে গেছে। সব নৌকার মত বঁড়শি ছুঁড়তে হবে বলেই যেন ছুঁড়ে দিল।—তার জন্য কোনো বিধি নিষেধ মানতে পারল না ওরা। বঁড়শি ফেলে চুপচাপ বসে থাকল। এখন আর শরীর থেকে ঘাম ঝরছে না। স্নান করায় শরীরে প্রশান্তি নেমেছে এবং ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে। মুখ ফুটে কেউ কিছু বলল না। নৌকাটা অন্যান্য নৌকার সঙ্গে স্রোতের টানে নামছে: আকাজদ্দির নৌকা পিছনে। ওরা বারদী পর্যন্ত উজান দিয়েছিল। ওরা বারদী থেকে বঁড়শি ফেলে আসছে।

ভুলু বঁড়শির শেষপ্রান্তটা গুড়ার সঙ্গে বেঁধে বাকি কিছু অংশ গোল গোল করে প্যাঁচ দিয়ে রেখেছে। বঁড়শির সব সুতোর প্রায় অর্ধেকটা হাতের কাছে মজুদ রেখেছে। এই ভাটিতে নারাণও তাই করল। আরশোলার কৌটায় জল ঢুকিয়ে ভুলু নিজের বঁড়শির সঙ্গে সুতো বেঁধে ছেড়ে দিল। পচা আরশোলার গন্ধ যাতে নদীর তলায় ছড়িয়ে পড়ে, সেজন্য ঝাঁঝরা করা আছে কৌটাটা। আরশোলার কৌটাটার সুতোটাও গুড়াতে বেঁধে বঁড়শির সুতোয় ধীরে ধীরে ছোট বড় টান দিতে থাকল। ভুলু যেন আজ মাঝগাঙে বেলে মাছ ধরতে এসেছে, তেমন ভাব।

পরিষ্কার আকাশ মেঘলা হতে শুরু করেছে ফের। আকাশের এই ছায়া ছায়া ভাবটা এদের ভাল লাগল। তবে দিনটা যেন খুব খারাপ না হয়। জল-ঝড়ের প্রত্যাশা তারা করে না। বিকেলের শেষ ভাটি দিয়ে ওরা গাঁয়ে ফিরবে। তার জন্য কয়েকটা আরশোলাকে ভিন্ন করে রেখেছে নারাণ। নারাণ খুব মিইয়ে পড়েছে। বিকেলে জল-ঝড় হলে আর কোনো আশাই থাকবে না। সেজন্য সে বার বার আকাশটাকে দেখছিল। যে ভাবে মেঘেরা দক্ষিণ থেকে উত্তরে নেমে আসছে, বিকেলে জল-ঝড় না হয়ে যাবে না। নারাণ আকাশের ওপর বিরক্ত বোধ করছে।

আকাশ আর এই জল, জলের রেখা, জলের নীচে ঢাঁইন মাছ দুদিন ধরে যে উত্তেজনার খোরাক বহন করছে, আগামী কাল থেকে সেটা

আর থাকবে না। গাঁয়ের জীবনটাকে খুব সাদামাটা মনে হ'তে থাকল নারাণের। তবু শঙ্খিনীর মৃত্যু ওকে আরো দুদিন উত্তেজনার ভিতর বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করবে। ঐটুকুই চাঁইন শিকার করতে এসে লাভ। একটা জ্যান্ত শঙ্খিনীকে পাটাতনের নীচে চাঁইয়ের ভিতর বন্দী করে রাখতে পেরেছে, সে আবার খুশী হতে থাকল।

গোপালদীর স্টিমার মাঝগাঙ ধরে চলে গেল। বয়াগুলোর পাশে রেলিং ধরে ওপরের ডেকে, নীচের ডেকে, মেয়ে-পুরুষ গিজগিজ করছে। ভুলু দেখে দেখে অবাক হতে থাকল। সে একবার একটি ছোট লঞ্চ দেখেছিল, দেখে ভেবেছিল—কত বড়! আর এ যেন সমস্ত নদী ধরে, নদী উথাল-পাতাল করে সামনে গিয়ে নামছে।

ঘাসী-নাও, ছোট বড় কোষা-নাও, এক মাল্লা দু'মাল্লা—সব নৌকা ভয়ে জড়সড়। বড় বড় ঢেউ এসে নৌকার তলায় লাগছে আর মানুষগুলো সব লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। স্টিমারটার এই কেরামতি দেখে ভুলু হাসতে থাকল। মনে হল আফাজদ্দির নৌকাটা বড় ছোট। ভুলু যদি কোনদিন স্টিমারটার মাঝি হতে পারত!

নদীর বাঁকে যতক্ষণ স্টিমারটা দেখা গেল ততক্ষণ দেখল। দু-দিকের দুটো বড় চাকা দেখল। চাকা দুটোকে জল ভাঙতে দেখল। ভুলু বইয়ে স্টীম-ইঞ্জিনের কথা পড়েছে এবং জেনেছে স্টিমারটার অনেক রহস্য—মাঝিদের বৈঠা ফেলতে হচ্ছে না, লগি বাইতে হচ্ছে না, অথচ স্টিমার ঠিক চলেছে। মাঝিরা এ-জাহাজে খুব আরামে থাকে, কোনো কাজ নেই, খায়-দায় আর নদীর-দু-তীর দেখে। বড় হলে এমন একটা কাজই জীবনে সে বেছে নেবে। দেশ দেখাও হবে, অন্যমনস্ক হলে কেউ কিছু বলতেও পারবে না। সে কিছু ভাবার চেষ্টা করছিল এমন সময়ই সে অনুভব করল ওর হাতটা কে হ্যাঁচকা টান মেরে নদীর তলায় ওকে সুদ্ধ ডুবিয়ে দিতে চাইছে। সে জলের ওপর ঝুঁকে পড়ল এবং ব্যাপারটা বুঝে উঠতে না উঠতেই আর-একটা হ্যাঁচকা খেল। সে উল্টে নৌকা থেকে জলে পড়ে গেল। গোল-করা সুতোগুলো গড় গড়িয়ে নামছে, যেন নদীর নীচে নোঙর

নামছে।' হারাণ চিৎকার করে উঠল, ভুলু জলে পড়ে গেছে! ভুলু নৌকার তলায় ঢুকে গেছে!

নারাণ বঁড়শি ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি হালে এসে নৌকাটা ঘুরিয়ে দিল। আর ভুলু পাশ থেকে হাত বাড়িয়ে দিল। ওরা দুজন ওকে নৌকায় তুলতে সাহায্য করলে। সে ঝাঁকি মেরে নৌকায় উঠে বঁড়শির সুতোটার ওপর আবার ঝুঁকে পড়ল। দেখল ধীরে ধীরে বঁড়শির সুতো নীচে গিয়ে নামছে। সে সুতোটা হাতে তুলে দেখল নীচ থেকে সুতোটা কেবল হ্যাঁচকা খাচ্ছে। নারাণ, হারাণ কোনো কথা বলতে পারছে না। নারাণের মাছ-ধরার প্রত্যয় এমনভাবে নষ্ট হয়ে গেছে, যে সে এতসব দেখেও বুঝতে পারল না জলের তলায় বঁড়শিতে মাছ আটকা পড়েছে, না আর-একটা মরা মানুষ প্যাঁচ খাচ্ছে।

শেষ সুতোর প্যাঁচটা যখন নৌকা থেকে নেমে গেল, একটা দিক তল হয়ে যখন নৌকাটা কেবল পূব থেকে পূবে ছোটার চেষ্টা করছে, সুতোটা যখন গুন-টানা নৌকার মত হয়ে গেল তখন ওরা তিনজন আনন্দে অভিভূত হতে হতে খাল বিল নদীতে, আকাশে আকাশে, দিগন্তে দিগন্তে একটা গোপনীয় খবর পাঠাতে লাগল, আমাদের ছোট মানুষের নৌকায় বড় টাঁইন আটকেছে। ওরা তিনজন চুপ করে বসে থাকল। 'টাঁইন আটকে গেছে' বলে এখন আর চিৎকার দিতে পারছে না। ওরা মাছটাকে আয়ত্তে আনার জন্য জীবনের সব কিছুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে সুতোর রেখাটার দিকে অপলক চেয়ে আছে। সুতোটা কখন নরম হবে কখন ওরা ধীরে ধীরে মাছটাকে খেলিয়ে নৌকায় তুলতে পারবে। ওরা এ-জন্য আকাশ দেখল না, নদীর জল দেখল না, অন্য নৌকা দেখল না, মাছটা ওদের টেনে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, তাও দেখল না। ওরা কেবল দেখতে চাইল সুতোটাকে এবং জলের তলার মাছটাকে। মাছটা এখন এ নৌকার তিনজনের মতই আর একজন। ওরা মোট চারজন হয়ে গেল। নৌকাটা ওদের চারজনের হয়ে পূব থেকে পূবে ছুটছে।

নারাণ যেন ধীরে ধীরে তার চেতনাকে ফিরে পাচ্ছে। সে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। ভুলুর মুখটা সে দেখল বার বার করে। ভুলুকেই এখন মাছের রাজার মত দেখাচ্ছে। ভুলুকে সে এবার আনন্দে জড়িয়ে ধরল। অথচ নারাণ বুঝতে পারছে না কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম ব্যথাও বাজছে সেই আনন্দের সঙ্গে। দুদিনের এই অমানুষিক পরিশ্রম ভুলু ঢাইন শিকার করে সার্থক করে তুলল। আনন্দে নারাণ পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল, দু হাত এবং বৈঠা আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে চিৎকার করে উঠল, ঢাইন! ঢাইন!! ছোটমানুষের নৌকায় ঢাইন আটকেছে।—সকলকে সে খবরটা দিয়ে অবাক করে দিতে চাইল। আকাজদ্দি, ঈদা, দেখ দেখ ভুলু কি কাণ্ড বাঁধিয়েছে দেখ! সকলকে যেন বলতে চাইল, নৌকাটা পুব থেকে পুবে কি ভাবে ছুটছে দেখ! কিন্তু সে মানুষগুলোকে, নৌকাগুলোকে খুঁজতে গিয়ে দেখল একটি নৌকা, একটি মানুষও কাছে নেই—সব বিন্দুবৎ হয়ে গেছে, তখন সে হারাণকেই যেন আঙুল তুলে বলল, দেখলি, দেখলি ভুলুটা কি করেছে! আমার নসিব মন্দ, আমার মন্দ কপাল, মাছের রাজা আর হতে পারলাম না আমি।—বলতে বলতে নারাণ কেঁদে ফেলল।

ভুলু অবাক হল, চিন্তিত হল নারাণকে কাঁদতে দেখে। প্রথমে বুঝতে পারল না নারাণের চোখ থেকে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল কেন! নারাণের গলাটা আড়ষ্ট হল কেন! ধীরে ধীরে ভুলুর চেতনাও ফিরে আসছে, সে বুঝতে পারল নারাণের ব্যথাটা কোথায়। মাছটা নারাণের বঁড়শিতে আটকাল না, ওর কষ্ট হচ্ছে সেজন্য। নারাণের ধারণা মাছের রাজা সে হতে পারে নি। ভুলুর বঁড়শিতে মাছ আটকেছে, মাছের রাজা ভুলু।

ভুলু নারাণকে কাছে টেনে বলল, বঁড়শিটা তোর। তোর বঁড়শি-টাতেই ঢাইন আটকেছে। বঁড়শি জলে ছোঁড়ার সময় বদল হয়ে গেছে। সুতোটা দেখলেই বুঝতে পারবি।—ভুলু একটু সরে বসল।—এখানে তুই বোস নারাণ। তোর বঁড়শির মাছ, তুই এবার খেলিয়ে তোল।

হারাণ হাল থেকে বলল, আমাকে একটু দেখতে দিবি সুতোটা? সুতো কেমন করে নড়ছে দেখব।

ভুলু হালে গিয়ে বসল। নারাণ, হারাণ পাশাপাশি এখন। নারাণ সুতো ধরে এই প্রথম টান দিল। মাছটা কিছু ঢিল দিয়েছে। নারাণ খুব সন্তর্পণে প্যাঁচ দিচ্ছিল। কিন্তু সে টান দিয়ে বুঝল বিরাট একটা মাছ বঁড়শিতে ধরা পড়েছে। মাছটা কত বড় হতে পারে তার একটা আন্দাজ সে করতে লাগল। সে ভেবে পেল না মাছটাকে সে কত বড় করে ভাববে। নৌকার মত বড় করে ভাবার ইচ্ছা হল নারাণের। প্রকাণ্ড মাছটাকে গোটা নৌকায় জায়গা দিতে পারবে না—তেমন করে ভাববার সময় দেখল চাঁইন উত্তরমুখী উজানে টানছে নৌকাকে। চাঁইন পূব থেকে পূবে গিয়ে চরে গোঁত্তা খাচ্ছে না, কিংবা ভেসে উঠছে না। সে আবার উজানে উঠতে শুরু করেছে।

ভুলুকে নারাণ বলল, মাছটা খুবই প্রকাণ্ড, দেখছিস না ওটাকে উজান পর্যন্ত টানতে পারছে। খুব বড় না হলে পারে? নারাণ ভাবল নিরঞ্জনের কথা! ওরা বলেছে চাঁইন আটকালেই ভাটার মুখে গিয়ে থাকবে, নয়ত পূব থেকে পূবে ছুটবে। উত্তরমুখী ওরা উজান ঠেলতে পারে না। অথচ এই মাছটা উজানে ছুটছে। বঁড়শি ছিঁড়ে যাবার ভয় আছে এখন। নারাণ ভুলুকে সেই ভয়ের কথাটা ভেঙে বললে ভুলুর উত্তেজনা একেবারে কমে গেল। সে হালে বসে একশবারের মত জপ করল, ঈদার বঁড়শিতে চাঁইন উঠুক, চাঁইন উঠুক। সে তার ভগবানকে জানাল, পরের অনিষ্ট চিন্তা আর সে করবে না। অন্যের অনিষ্ট চিন্তা করলে নিজের অনিষ্ট হয়। চাঁইন বঁড়শি থেকে ছুটে গিয়ে ভুলুর অনিষ্ট হতে পারে। ভগবান এ-ভাবে ভুলুর ওপর পাল্টা নিতে পারেন। এখন যে চাঁইন মাছটা উজানে জল কাটছে সে হয়ত পাল্টা নেবার জন্যই।—ভগবান তুমি মাছটার মুখ ভাটার দিকে ফিরিয়ে দাও। কারো অনিষ্ট-চিন্তা আমি আর করব না, ঈদার বঁড়শিতেও একটা বড় চাঁইন দিও। মনে মনে 'ঈদার বঁড়শিতে চাঁইন দিও' জপটাকে সে

একশবারের মত গুনে শেষ করল। ঠিক ওর ছেলেবেলার হেইর হিটলারের মত। হেইর হিটলারের যুদ্ধজয়ের জন্য ভুলু সে সময় তার ভগবানকে একশবার করে রোজ ভোরে উঠে জপ করত—ভগবান তুমি হেইর হিটলারকে জিতিয়ে দাও। হেইর হিটলার ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, সুতরাং তিনি ভুলুর বন্ধু। ভুলুর মাস্টার-মশাই বলত, পোলাণ্ড নিয়ে গেছে, একদিনে প্যারির পতন। ইংরেজ ভয়ে এখন থরহরি কম্প। ভুলু প্রত্যেক দিন সকালবেলা রাইনাদীর পুকুর-পাড়ে (ভুলু তখন ক্লাশ টুয়ে পড়ে) বসত। জলের ওপর ওর যে ছায়াটা পড়ত তার সঙ্গে বসে বসে সে কথা বলত এবং অঙ্গভঙ্গী করে তার বন্ধু যুদ্ধে জিতছে সে খবর পর্যন্ত দিত। সে সেখানে নিভৃতে বসে তার ভগবানকে ডাকত, বলত, ভগবান হেইর হিটলারকে তুমি সব যুদ্ধে জিতিয়ে দাও। অনেকবার, প্রায় একশবারের মত জপটা করত। ওর ধারণা ছিল, এ-ভাবে নিভৃতে বসে ভগবানকে ইচ্ছার কথা জানালে তিনি নিশ্চয়ই খুশী হয়ে হেইর হিটলারকে সব যুদ্ধে জিতিয়ে দেবেন। কিন্তু যেদিন মাস্টারমশাই বললেন, হেইর হিটলার হারতে আরম্ভ করেছে, সেদিন রাত্রে ভুলুর চোখে ঘুম এল না, কেন এমন হল! সে তার ভগবানকে এত ডেকেছে তবু তার ভগবান রাগ করলেন কেন! সে অনেক ভেবে রাতেই স্থির করতে পারল—যুদ্ধ জিনিসটাই খারাপ। ভুলু এতদিন অনেকগুলো মানুষের প্রতি হিংসা করছে এবং অনিষ্ট-চিন্তা করছে। সেজন্যই তার ভগবান হেইর হিটলারকে হারিয়ে দিলেন। এবার সে তার ভগবানকে জানাল, ভগবান, আমি কারো অনিষ্ট-চিন্তা করব না। হেইর হিটলার আমার যেমন বন্ধুলোক, তেমন সে সকলের বন্ধুলোক হোক। সেই ধারণাগুলো এখনও ভুলুর মনে সময় সময় কাজ করে। এইসব ধারণাগুলো ভুলুর মনে কি করে জন্মাল সে বলতে পারে না, বুঝতে পারে না। কিন্তু এই প্রত্যয়গুলোকে সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে। অন্যকে হিংসা করতে নেই। সে ঈদা, আঁক্কা-জদ্দিকে আর কখনও হিংসা করবে না। সে ভেবেছিল পথে দেখা হলে ঈদার সঙ্গে একটি কথা বলবে, এবার ভাবল অনেক কথা বলবে,

ঠিক আগের মত। বুঝতেই দেবে না সে রাগ করেছিল ঈদার ওপর! ইস্! ঈদা যদি এখন এ নৌকায় থাকত!

আকাশটা ঘোলা ঘোলা হয়ে উত্তর-পশ্চিমে ক্রমশ গভীর কালো রঙ ধরেছে। আকাশের এ-ভাবটাই খারাপ। সমস্ত আকাশে যদি মেঘ ছড়িয়ে থাকে তবে জোর বৃষ্টি হবে। উত্তর-পশ্চিম কোণে যদি শুধু কালো এক টুকরো মেঘ গজরাতে থাকে, তবে ঝড় হবে। আর সারা আকাশ এবং ঐ কোণে যদি কালো রঙ ধরে তা হলে ঝড়জল দুই হবে। হারাণ আকাশ দেখে বুঝল আজ ঝড়জল না হয়ে ছাড়ছে না। সে চারিদিকে চাইল—কোথাও কোনো গ্রাম দেখা যাচ্ছে না, তারা এক অত্যন্ত অপরিচিত জায়গায় এসে থেমেছে। হারাণ ভয়ে ভয়ে বলল—নারাণ, আমার মনে হয় সেই ডাকাত-চরে আমরা এসে গেছি।

নারাণ সে কথার জবাব না দিয়ে অন্য কথা বলল, আমার মনে হয় সুতোর চারটে বঁড়শিই মাছটার মুখে, চোয়ালে, ঠোঁটে, গলায় গেঁথেছে। তোর কি মনে হয় হারাণ?—নারাণ জল থেকে মুখ না তুলেই কথা বলছিল। ওর মনে হচ্ছে মাছটা ফের পশ্চিম-মুখে ছুটেছে।

হারাণ একটু বিরক্ত বোধ করল। হারাণ আগে যেখানে বসত, সেখানে গিয়ে চুপ করে বসল। আকাশটা দেখল। এবং চারিদিকে চেয়ে সে নিজেকে এবং নৌকাটাকে খুব অসহায় ভাবল। পাটাতনের নীচে শঙ্খিনী ফোঁস ফোঁস শব্দ করছে। হারাণ সে শব্দও শুনতে পাচ্ছে। আর কোথাও কোনো শব্দ নেই। ভুলু পাথরের মত হালটা ধরে বসে আছে। নৌকাটা পশ্চিম-মুখো ছুটেছে। হারাণ একটু একটু করে আশ্বস্ত হচ্ছে এখন। শঙ্খিনীর কথা মন থেকে মুছে গেল তার। নদীর পশ্চিম তীর দেখার জন্য সে উন্মুখ হয়ে থাকল।

শঙ্খিনী গুঁড়ি মেরে সেখানেই পড়ে আছে, নড়তে পারছে না। মেরুদণ্ডটা শিথিল। শঙ্খিনীর আফসোস, ছোবল দিতে পারল না। শঙ্খিনীর মনে হচ্ছে দুটো মুখ দিয়ে রক্ত উঠে আসছে, সে যেন বুঝতে

পারছে ওর বিষদাঁত ভেঙে গেছে। কিন্তু ওদের তিনজনের সকলেরই ইচ্ছা এখন মাছটা জলের ওপর ভেসে উঠুক। লেজ থেকে মাথা পর্যন্ত দেখতে পাক। ধীরে ধীরে মাছটা নিস্তেজ হয়ে পড়ুক—এ ভাবনাটাও ওদের মনে উদয় হল। অবশ্য নারাণের ইচ্ছা মাছটা ইচ্ছামত নৌকা নিয়ে মাঝিদের মত গুণ টানুক। কিন্তু আকাশের অবস্থা দেখে ওরও যেন বলতে ইচ্ছে হল, আর কত খেলবি, এবার জলের ওপর ভেসে উঠে পিঠ দেখিয়ে দে, আমরা নিশ্চিন্ত হই—বাড়ি ফিরি। দশটা-পাঁচটা গ্রামের লোক তোকে দেখতে আসুক।

জল আর জল এখানে। কোনো ঘূর্ণি নেই, জলের স্রোত কম। জলের গভীরতা কম। লক্ষ লক্ষ চড়ুই-পাখির মত পাখি জলের ওপর দিয়ে দিগন্তরেখার দিকে উড়ে যাচ্ছে। দু-একটা বড়-ছোট মাছ জলের ভিতর নড়ছিল। হাল ধরে ভুলু সব টের পাচ্ছে। কিন্তু মাছটা ভেসে উঠছে না। পশ্চিমের দিকে চলতে চলতে হঠাৎ থেমে পড়ছে, কখনও হ্যাঁচকা দিয়ে নৌকাটাকে তীরের মত ছুটিয়ে নিচ্ছে। অথচ এত ছুটেও মাছটা দমছে না, ভেসে উঠে বলছে না, এবার তোমরা আমায় নৌকায় তোল।

নারাণ এক সময় শুধু বললে, মাছটা আবার বৈদ্যের-বাজারের দিকেই ছুটছে! আমরা কোথায় আছি জানিস (কথা বলার সময় নারাণ সুতোর রেখা থেকে অন্যমনস্ক হয় নি)। সেই মেঘনার বালির চরে, যেখানে ডাকাতেরা এসে সন্ধ্যায় জড় হয়। বর্ষাকালে এ-জায়গা সমুদ্রের মত। দেখ, দেখে নে। কলিমদ্দির ঢাইন এখানটায় গতবার এসে ঘুরে গেছে। বঁড়শি গেলার পর মাছগুলো উজান আর ঠেলতে পারে না। স্রোত যেখানে কম সেদিকেই ওরা যেতে চায়।

হারাণই প্রথম চিৎকার দিয়েছিল, পরে ওরা দুজন। ওরা দেখে অপলক হল, বিস্মিত হল। ভয়ার্ত কণ্ঠে হারাণ বলছে, দা দিয়ে সুতো কেটে দি নারাণ, নয়ত মাছটা নৌকাটা আমাদের ডুবিয়ে দেবে।

মাছটা সে সময় জলের ওপর ভেসে উঠল না, শুধু জলের ওপর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুটো লাফ দিয়ে নৌকাটাকে ডুবিয়ে দিতে চাইল যেন। মাছটা ওদের কোষা-নৌকার চেয়েও যেন বড়। মাছটা এখন ওদের নৌকার দিকেই তেড়ে আসছে। ওদের নৌকাটাকে ডুবিয়ে দেবে তেমন ভাব। কিন্তু কিছুদূর এসেই মাছটা ধীরে ধীরে ডুবে গেল। ভুলু ভাবল ওদের তিন জন ছোটমানুষকে দেখে মাছটার দয়া হয়েছে! সেজন্যই জলের তলায় হারিয়ে গিয়ে নৌকাটাকে আবার টানতে থাকল। মাছ দেখতে এত সুন্দর হয়! সে ভেবে অবাক হল! মাছটা যেন একটা রূপোর কোষা-নৌকা, মুখে যেন ভোরের সূর্য উঁকি মারছে।

নারাণ ফিস ফিস করে বলল, শেষ পর্যন্ত মাছের রাজাকেই ধরে ফেললাম। দেখলি মাছের মুখটা! লেজটা!!

—সব দেখেছি, এখন ভালোয় ভালোয় নৌকায় ভেড়াতে পারলেই হয়। —হারাণ কথাগুলো বলে ভাবল, চাইন মাছের শুঁটকি দিতে হবে এবার। বছর ধরে খাওয়া যাবে। গঙ্গা জেলেকে চার আনা পয়সা দিলেই ওর ভাগের মাছটা শুঁটকি দিয়ে দেবে। হারাণ আরো কিছু ভেবে ফের আকাশের দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে নৌকাটাকেই বকতে থাকল। যেন আকাশটা ওর শত্রু, দুশমন। দিনটাকে এমন অন্ধকার করে দিয়েছে যে মনে হয় বালির চরে এখনই রাত নামবে। ঝির ঝির বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। উত্তর-পশ্চিম কোণের কালো মেঘটা ওপরে উঠে আসছে। ঝড় আরম্ভ হলে হয় নৌকা ডুববে, নয়ত সুতো ছিঁড়ে মাছটা ছুটবে। দুটোর একটাও সে চায় না। কাজেই আজ এই মুহূর্তের জন্য ঝড়কে বিদায় করে দিতে চায় সে। সে ডাকল, মা-কালী, তোমাকে একটা আস্ত পাঁঠা দেব। এ-আকাশটা থেকে ঝড় তাড়িয়ে অন্য আকাশে নিয়ে যাও।

বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি হতে থাকল। সঙ্গে বাতাস রয়েছে। বাতাস দমকা নয়, রয়ে-সয়ে। ওরা বৃষ্টির ভিতর ভিজতে থাকল। জলের ওপর বৃষ্টির শব্দ খুব জোর হচ্ছে। নারাণ বাতাস দেখে ভয়

পেল। কোনদিকে মাছটা টানছে নৌকাটাকে! সুতো টেনে সে বুঝল এখন তেমন ভয় নেই। বাতাসের পক্ষেই মাছটা নৌকাটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তবু সে হুঁশিয়ার হতে ছাড়ল না। জলের শব্দে ওর কথা শুনতে পাবে না ভেবে সে চিৎকার করে ওদের দুজনকে বলতে থাকল, পাটাতনের নীচ থেকে জলটা ছেঁচে ফেল।—তারপর গলাটা একটু নামিয়ে বলল, যদি মাছটা বাতাসের বিপরীত দিকে টানতে থাকে তাহলে তোরা হাল ছেড়ে দিয়ে বৈঠা মেরে মাছটার সঙ্গে চলতে থাকবি। তাহলে সুতো ছেঁড়ার ভয় থাকবে না।

ওরা দুজন বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে সব শুনল। সব দেখল। মাছটা এখন নদীতে গিয়ে নামার জন্য প্রাণপণ ছুটছে। মাছটা জলের ওপর ভেসে চলেছে। ওরা দুহাত তুলে বৃষ্টিতে ভিজে ওদের সমস্ত উত্তেজনাকে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিল। হারাণ পাটাতনের ওপর পাগলের মত ধেই ধেই করে নাচতে লাগল। নারাণ এক হাতে আকাশে জল ছিটিয়ে বলল, পাগল, তোরা সব পাগল!

ভুলু বৃষ্টিতে ভিজছে আর ভিজছে। শীত করছে ওর। বাতাস অত্যন্ত ঠাণ্ডা লাগছে। সে হাল থেকে উঠল না। ওরা এখন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, বৃষ্টি এমন ঘন যে দূরে টাইনের পিঠ আবছা দেখাচ্ছে। ভুলু হাল আগের মতই ধরে আছে। মনে মনে জানছে নৌকাটা চলছে পশ্চিমমুখো। বৃষ্টি কমলে বুঝতে পারবে পশ্চিমমুখো কি দক্ষিণমুখো। জলের স্রোত এখানে এত কম যে স্রোত দেখেও বোঝার উপায় নেই ওরা কোনদিকে চলেছে। বৃষ্টিটা কুয়াশার রং ধরে নামছে।

আকাশে দুবার বিদ্যুৎ চমকাল। কড়কড় করে কোথায় দুটো বাজ পড়ল।

নারাণ মাছটার চলার ভঙ্গী দেখেই বুঝতে পারল, ক্রমশ ওটা নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। টাইনটা এখন জলের ওপর ভাসল, ডুবল ভাসল। অনেকক্ষণ এমন করার পর আর ভাসল না। এক জায়গায় চুপ করে পড়ে থাকল। নারাণ ঈদার কথামত হাতের চারিদিকে

গামছা পেঁচিয়ে সুতো টানছে এবার। নীচ থেকে একটা পাথর উঠে আসছে যেন। ভুলুকে সে কাছে ডাকল। সঙ্গে কোঁচ নেই বলে খুব আফসোস। মাছটা হাতের কাছে এলেও কি সহজে ধরা দেবে। মাত্র একটা উপায় আছে, নৌকার দড়িতে ফাঁস লাগানো এবং সেই ফাঁসটা চাঁইনের গলায় পরিয়ে দেওয়া। তারপর ওরা তিন জন এক সঙ্গে টেনে মাছটাকে নৌকায় তুলবে। নারাণ সে তার ভাবনাগুলোকে অন্য দুজনকে ব্যাখ্যা করল। এখন সে দেখতে ডেঙ্গুরে-জ্যাঠার মত। চোখ দুটো জ্যাঠার মতই জ্বলছে, চোখের নীচে কালি পড়েছে। খুব শীর্ণ লাগছে দেখতে।

চাঁইনটা ধীরে ধীরে নৌকার কাছে উঠে এল। নারাণ পাটাতনে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। মাথাটা জলের ওপর ভেসে উঠেছিল একবার, আবার ডুবে গেল। নারাণ সুতো একটু ঢিল দিল। হারাণ পাটাতনের ওপর থেকে লাঠিটা তুলে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল, আবার মাছটা কাছাকাছি এসে ভাসলে লাঠি দিয়ে মাছের মাথায় বাড়ি মারবে। এক বাড়িতেই চাঁইনের রাজা মরে ভূত হবে। তখন টেনে তোলা অথবা টেনে না তুলতে পারলে দা দিয়ে কেটে মাছটাকে বাঁধাছাদা করা, মজুদ করা পাটাতনে—এ-কাজগুলো সে একাই করতে পারবে।

চাঁইনটা আবার ভাসল, নৌকার খুব কাছে এসে ভাসল। নিরীহ মাছটা শুধু লেজ নাড়ছে আর মুখটা মাঝে মাঝে হাঁ করে দিচ্ছে। নারাণ বুঝতে পারল মাছটা নৌকার মতই লম্বা হবে। পৃথিবী জয় করার ভাব মুখে নারাণের। শঙ্করী-বৌদি, হেনা, খুসিকে দেখিয়ে বলবে, দেখলি কত বড় মাছ ধরে আনলাম! দেখ কেমন তাজা!—নারাণ সন্তর্পণে সে সময় নৌকার কিনারায় এসে দাঁড়াল। লাঠির বাড়ি তুলল মাছের মাথাটাকে ফাটিয়ে দেবার জন্য। পিছন থেকে লাঠিটা ধরে ফেলল ভুলু এবং লাঠিটা জোর করে নারাণের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিল। বলল, নারাণ তুই এমন অমানুষ! এই নিরীহ মাছটার মাথায় লাঠির বাড়ি দিয়ে মেরে ফেলতে চাস!

চাঁইন মাছ এত নিরীহ! ভুলু অবাক হল। চাঁইনটা এখন যেন খুব ইচ্ছা করে নৌকার কাছে এসে ভিড়ছে, ওদের তিন জনের বন্ধুত্ব চাইছে। মাছটার শুঁড়গুলো নড়তে দেখল ভুলু। লেজটা জলের নীচে খেলাচ্ছে। ভুলুর খুব আদর করতে ইচ্ছে হল মাছটাকে।

হারাণ মাছের সুতোটা ধরে রেখেছে। নারাণ সুতোর ভিতর দিয়ে দড়ির ফাঁসটা গড়িয়ে ছেড়ে দিল। দড়ির ফাঁসটা ধীরে ধীরে চাঁইনের গলায় আটকে গেল। নৌকার খুব কাছে টেনে আনা হয়েছে মাছটাকে। এবার নারাণ এবং হারাণ টেনে পাটাতনের ওপর মাছটাকে তুলতে চাইল। ভুলু ওদের হাত চেপে ধরল। তখন, পাটাতনে তুললে মাছটা মরে যাবে।

ওরা দুজন হাসল। কিন্তু তুলতে গিয়ে দেখল ওরা দুজনে কিছুতেই পারছে না। নৌকা কাত হয়ে যাচ্ছে। নৌকা ডুববে মাছটা তুলতে গেলে। কি করা যায়! ওরা দুজন ভাবতে থাকল।

ভুলু যদি এখন ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়, নৌকাটা ডুববেই ডুববে।

ভুলুর কাছে বুদ্ধি চাইল নারাণ।—কি করব বল?

—কি আর করবি। যা করছিস তাই কর!

ভুলুর যেন বলতে ইচ্ছা হল, মাছটার ত আর প্রাণ নেই। কাজেই ওকে ফাঁসি পরানো চলে, লাঠি দিয়ে মাথায় বাড়ি মারা যায়। সে যখন তোমাদের হাতে তখন যা খুশি তাই করতে পার। সব রকমের অত্যাচারই তোমরা করবে, এ আমি জানি। জানি বলেই বলতে চাইছি কি দরকার এটাকে মেরে। তার চেয়ে জলে মাছটা রেখে গুড়াতে দড়ি বেঁধে রাখ। ফসকা গিঁট আর একটু আলগা করে দে এবং আর একটা গিঁট মার। মাছটার গলায় তত লাগবে না। সে বাঁচবে। যতক্ষণ নৌকাটা চলবে অন্তত ততক্ষণ। মোদ্দা কথা, ওকে তোমরা আরো দুদিন বাঁচতে দাও।—ভুলুর রাগটা সহসা ফের নিজেকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠতে থাকল। চাঁইন মাছটার জন্য ওর এমন দরদেরই বা আছে কি! আজ হোক, কাল হোক, মাছটা ত

মরবে। মনেপ্রাণে ভুলু নিষ্ঠুর হওয়ার চেষ্টা করল। সে ভাবল মাছটাকে কেটে ফেললে এখন খারাপ হবে। গাঁয়ে পৌঁছবে কাল কখন সে কথা ওরা কেউ বলতে পারে না। এখন কেটে ফেললে মাছটা রাত না পোহাতেই পচে যাবে। মাছটার জন্য মনেপ্রাণে নিষ্ঠুর হয়ে বিব্রত বোধ করছে সে। তবু সে জোর করে ভাবল মাছের জন্য মনটা যদি এত বেশী দুঃখ পায় পাক। নারাণের হাত থেকে লাঠিটা কেড়ে নিয়ে খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছে হয়ত, কিন্তু কাজটা খুব বিচারশীল হয় নি। হেনা, শঙ্করী-বৌদি এ-কথা শুনলে হাসবে। বলবে, স্বয়ং ভগবানের পুত্র! সর্বজীবে দয়া!—খুসি হেসে হেসে টিটকিরি দেবে। মেয়েটা যে আজকাল মন্দ কথা বলতে শিখেছে!

—কি রে কথা বলছিস না কেন? আমাদের কথায় রাগ করার কি আছে শুনি? যা হয় একটা বুদ্ধি দে।

—আমি আবার কি বুদ্ধি দেব!

—মাছটা আজ হোক কাল হোক মরবে। এর জন্য মন খারাপ করলে চলে?

—মাছটা মরলে আমার মন খারাপ হবে, তেমন কথা আমি বলেছি? আমি কি পাগল!

—আবার তোর সেই রাগ?

—বলছিস যে মাছটা মরবে। মরার জন্যই ত মাছটা ধরা। ওটা জ্যান্ত আমরা খাব, পাগল ছাড়া তেমন কথা কে ভাবে!

নারাণ ভুলুর অভিমান ভাঙাবার জন্য হেসে কথা বলল—আর কথা বাড়াস নে, এখন কি করব বল।

—তোরা আমার কথায় প্রথম হাসলি কেন? মাছটা পাটাতনে তুলতে বারণ করলাম, মাথায় বাড়ি মারতে বারণ করেছি, আমরা কাল কখনতক বাড়ি ফিরব ঠিক নেই বলে। আজ চাঁইনটাকে মেরে ফেললে কাল মাছটাকে খাওয়া যাবে? নতুন জলের মাছ পচে যাবে না! অথচ তোদের হাত চেপে ধরায় তখন খিল খিল করে হাসলি। ভাবলি যেন আমি কত ছেলেমানুষের মত কাজ করছি!

নারাণ ভুলুকে খুশী করার জন্য মাছটার গলার ফাঁস আর একটু আলগা করে গুড়ার সঙ্গে বেঁধে রাখল।

বৃষ্টি কমে আসছে, বৃষ্টি এখন ঘন নেই। ওরা তখন অন্য তীর দেখতে পেল। পশ্চিমের আকাশটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। সূর্য লাল রঙ ধরেছে। জলের ছায়ায় সূর্য ডুবল এবার। সন্ধ্যা নামবে এক্ষুনি। রূপালী নদী সোনালী রঙে নেয়ে অন্ধকারের দেশে ডুব দেবে। রূপালী মাছ আঁধার রাতে জলের তলায় তখন লেজ নেড়ে ক্লান্ত হবে। আজ রাতে চাঁইন মাছের দেশে একটা বিষণ্ণভাব থাকবে। মাছের রাজা নিরুদ্দেশ, কোথায় গেল, কি হল! ওর পাগল-জ্যাঠামশাইয়ের নিরুদ্দেশের মত।

যেহেতু মাছটা গুড়ার সঙ্গে বাঁধা আছে সেহেতু ভুলু হালে বসে মাছটার মুখ দেখতে পাচ্ছে। চাঁইনের চোখ দুটো ছোট পাঁঠার বাচ্চার মত। কেমন মায়া-মাখানো। হেনার চোখ দুটো যেমন জানালার পাশে, চাঁইনের চোখ দুটোও তেমনি জলের ওপর—এক রূপ, এক রঙ। এই দুটো চোখ ওর কাছে হেনার চোখ দুটোর কথাই বলছে। বৃষ্টি নেই আর। ঘন অন্ধকার কেটে গেছে। নদীটার এখন সোনালী রঙ। ছোট বড় এলকোনা, ডারকীনা মাছ নদীর ওপর লাফাচ্ছে। ছোট ছোট অনেক মাছ চাঁইন মাছটাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেল। এত বড় মাছ! এত বড় চাঁইন! এ নদীতে এ মাছটাই হয়ত সকলের চেয়ে বড়। সকলের চেয়ে সুখী।

বৃষ্টি-ভেজা শরীর ভুলুর। জামা-প্যান্ট সব ভিজে গেছে। হারাণ, নারাণ দাঁড়ে বসার আগে জামা-প্যান্ট সব খুলে ফেলল শরীর থেকে। জামা-প্যান্টের জল চিপে আবার সেগুলো পরল। ভুলুর লজ্জা লাগল এক সঙ্গে শরীর থেকে জামা-প্যান্ট খুলে ফেলতে। সে প্রথম জামাটা শরীর থেকে খুলে চিপল। জামা পরে প্যান্ট খুলে চিপল, তারপর হালে বসে নদীটা দেখে ফের বিষণ্ণ হল। নদীর সর্বত্র সে প্রাণের সাড়া দেখতে পাচ্ছে। বৃষ্টি-ভেজা ফড়িংগুলো জল ছুঁয়ে নদীর রেখায় ছন্দ তুলছে। ওরা ঘুরছে, উড়ছে। আকাশে অনেক

পাখি, পাখির কণ্ঠে গান—কিচ কিচ শব্দ। নদীর তীর ধরে মানুষ যাচ্ছে, দূর থেকে খুব ছোট মনে হচ্ছে মানুষগুলোকে। পানসী-নাও একটা গাবেও। স্রোতের মুখে বাদাম তুলে নারাণগঞ্জ চলেছে। কেরায়া-নৌকা, যাত্রী-নৌকা, আরও কত কি। নদীর সোনা-গলা জলের তলায় কত মাছের কত আনন্দ। কত ছোট বড় তরঙ্গ নদীর। কাক. শালিখ, টিয়া, বাজার-হাট, নদীর ঘাটে কলসী-কাঁখে বৌ—সকলেরই প্রাণে যেন এক বিশেষ আনন্দ, যা সে হালে বসে অনুভব করতে পারছে। কিন্তু সব আনন্দগুলো চাঁইন মাছের বড় বড় চোখ দুটোয় এসে যেন থমকে দাঁড়াল। এই চোখ দুটোয় পৃথিবীর সব বিষণ্ণতা যেন ধীরে ধীরে জড় হচ্ছে। চোখ দুটো অদ্ভুত এক বেদনার কথা বলছে, আমাকে তোমরা যন্ত্রণা দিও না। আমি তোমাদের কোনো অনিষ্ট করি নি। তোমরা মরে যদি কোনোদিন মাছ হও, তোমাদের ভগবান আমার মত তবে তোমাদেরও সেদিন যন্ত্রণা দেবেন। ভুলু ইচ্ছা করেই চাঁইন মাছের চোখ থেকে নিজের চোখ সরিয়ে নিল। এ-ভাবে চেয়ে থাকলে সে যেন আরো অনেক বেদনার কথা শুনতে পাবে সেখানে। খুসি, শঙ্করী-বৌদি ভুলুর মনের এ ভাবটা যদি জানতে পারে তাহলে সেই কথাই বলবে—স্বয়ং ভগবানের পুত্র! সর্বজীবে দয়া! ওর ইচ্ছে হল বলতে নারাণকে, আমি আর তোদের সঙ্গে কখনও আসব না, মধুর চাক ভাঙব না, কচ্ছপ শিকারে যাব না। অথচ সে ভেবে পেল না মনের এ-ভাবটা তার আগো অনেকবার হয়েছে, কিন্তু দুদিন পর সব ভুলে নারাণকে বলেছে, আমাকে নিয়ে যাস নারাণ।···কোন এক অজ্ঞাত শক্তি ওকে কেবল 'বাহির বিশ্বে' টানছে।

॥ সাত ॥

যখন নদীর বুক থেকে শেষ আলোটুকু মুছে গেল, যখন যাত্রী নৌকার ছইয়ের নীচে লণ্ঠন জ্বালা হল, তখন বৈদ্যের-বাজার ঘাটে লগি পুঁতে নৌকাটা তাড়াতাড়ি বেঁধে ফেলল নারাণ। সে লাফ দিয়ে তীরে নামল। ভুলু, হারাণকে বসিয়ে সে হাটে গেল সওদা করতে। কাল ভোরে ওরা রওনা হবে, সুতরাং এখন দুটো রান্না করে খেতেই হবে। ক্ষিদেয় ওদের পেট জ্বলছে এবং রীতিমত ছটফট করছে তারা। ভুলু নদী থেকে কয়েক গণ্ডূষ জল তুলে খেল। হারাণ ভাবল, খালি পেটে জল খেলে বমি হতে পারে কিংবা রাতের খাওয়াটা নষ্ট হতে পারে। সে জল খেল না। মাছটার গায়ে-পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে তেলতেলে শরীরটা দেখল।

একে একে অন্যান্য মাছ-ধরার নৌকাগুলো তীরে এসে ভিড়ছে। অধিকাংশ নৌকা আজ চাঁইন ধরতে পারে নি। ওরা কাল পর্যন্ত থাকবে। ওরা লগি পুঁতল তীরে। নৌকা বাঁধল দড়ি দিয়ে। তারপর গুড়ি গুড়ি ছোটমানুষের নৌকার কাছে সকলে হাজির হল এবং মাছটা দেখল। মানুষগুলো চোখ বড় করে লণ্ঠন তুলে জলের ওপর মাছটাকে ভাসতে দেখল, লেজ নেড়ে খেলতে দেখল। একটা ভিড় জমে উঠেছে এখন।—কিগো মিঞারা, নৌকাটা ডুবিয়ে দেবে নাকি! হারাণ ভিড়টাকে ধমক না দিয়ে থাকতে পারল না। বুড়ো মানুষের মত নৌকায় বসে সে বিড়বিড় করছে। ভুলু ওদের ভিতর ঈদাকে খুঁজল। ঈদা দেখুক মাছটা, এই ইচ্ছা ভুলুর। কিন্তু ঈদা নেই, আকাজদ্দী নেই। ওরা হয়তো ফিরে গেছে কিংবা দামোদরদীতে গেরাফী ফেলেছে। ভিড়টা এখন মাছ সম্বন্ধে বলাবলি করছে। ভুলু ওদের কথাগুলো খুব আগ্রহের সঙ্গে শুনল। বলছে, মাছ বটে একখানা! এ মাছটা গাঙের কোথায় ছিল এতদিন! ওরা বলল,

মেঘনায় এতবড় টাঁইন আজ পর্যন্ত কেউ ধরতে পারে নি। ছোট-মানুষের বঁড়শিতে বড় মাছ ধরা দিল। ওরা আশ্চর্য হয়েছে, এতবড় মাছটাকে কি ভাবে আয়ত্তে আনল তারা। ওরা নানা রকমের প্রশ্ন করছে ভুলুকে, হারাণকে। হারাণই প্রায় সব কথার উত্তর দিচ্ছে। এ-বছরই ওরা প্রথম টাঁইন-শিকারে এসেছে এ-কথাটাও বলল হারাণ। তারপর সে টাঁইন মাছটা জলে ভাসলে গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে মাছটাকে আদর করল, যেন মাছটা হারাণের পোষা জন্তু।

ভিড়টা ক্রমশ বাড়তে থাকল! গ্রাম থেকে লোক এসে নামছে। মুখে মুখে খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে। গ্রামের ছেলেবুড়ো সব এসে জড়ো হল। টাঁইন মাছটা সম্বন্ধে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প বলতে থাকল ওরা। নদীতে যখন জল থাকে না বেশী, মাছটা তখন দামোদরদীর মঠের নীচে থাকত, তেমন কথাও শুনল ভুলু। নদীর এত বড় লক্ষ্মীমন্ত মাছ ধরে ওরা তিনজন ভালো কাজ করে নি। ভিড়ের খুব বুড়ো মানুষটা গল্প করছে অন্য মানুষের সঙ্গে—অনেক কাল আগে নদীতে এমন একটা মাছ জলে ধরা পড়ল আর গাঁয়ে মড়ক লাগল ভীষণ। এ-বছর কি হবে কে জানে! বুড়ো মানুষটা হাত পা ছুঁড়ছে আকাশের দিকে —মাছ ছেড়ে দাও বাপধনরা, গাঁয়ের মঙ্গল কর,—বুড়ো মানুষটার তেলতেলে চোখ মাছটার দিকে চেয়ে আছে।

ভুলু, হারাণ নিজেদের খুব অসহায় ভাবতে থাকল। এখনও নারাণ ফিরছে না, নারাণটা হাট করছে কি! গোটা হাট কিনে আনবে নাকি? এদিকে যেভাবে মানুষগুলো ভিড় করে দাঁড়িয়েছে তাতে হারাণ বুঝতে পারল, কিছু একটা অঘটন ঘটবে। হয়ত ওরা মাছটাকে জোর করেই দড়ি থেকে খুলে দেবে। সে খুব শক্ত হয়ে বসে থাকল।—পেটুক শালারা! মাছ দেখে লোভ সামলাতে পারছে না। সে গলুইয়ে বসে সকলের অলক্ষ্যে দাটা শক্ত মুঠোয় ধরে রাখল। যে নৌকায় উঠে আসবে তার ঠ্যাঙে এক কোপ!

এমন সময় নারাণ ভিড় ঠেলে নীচে নেমে এল। জল ভেঙে নৌকায় উঠে এল সে। নৌকায় উঠে ভিড়টাকে উদ্দেশ করে বলল,

কি ব্যাপার? সমস্ত গাঁ ভেঙ্গে পড়েছে দেখছি!—নারাণ নিজেকে এ-সময় খুব গুরুত্ব দিয়ে বলল, দেখলেন আপনারা কেমন মাছ ধরেছি। আমরা সম্মানদীর লোক। আমার নাম নারাণ, এই হারাণ আর ওর নাম ভুলু। মাছটা ভুলুই বঁড়শিতে আটকিয়েছে। মাছের রাজা আমি নই, মাছের রাজা ভুলু। —ভুলুর দিকে আঙুল তুলে নারাণ ভুলুকে নির্দিষ্ট করে দিল।

হারাণ ফিসফিস করে নালিশ দিল নারাণকে, জানিস না ত লোকগুলো কি পাজি!—ভিড়ের কথাগুলো সে সব খুলে বলল। নারাণ শুনল সব। গামছার পুঁটলিটা ভুলুর হাতে দিয়ে জলে নেমে দাঁড়াল। লগি থেকে দড়ি খুলে লগিটা পাটাতনে রাখার সময় ভিড়টাকে উদ্দেশ করে বলল, গাঁয়ে মড়ক লাগলে সকলের আগে মরবে ঐ বুড়ো হারামজাদা!—বলে, নৌকাটা জলের স্রোতে ঠেলে দিল এবং সেই সঙ্গে লাফ দিয়ে নৌকায় উঠে পড়ল। জলের স্রোতে নৌকাটাকে খুব বেগে চলতে দেখে হারাণ আশ্বস্ত হল। ওর আর ভয় নেই। সে উঠে দাঁড়াল এবার পাটাতনে এবং ভিড়টাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে দাঁটা দেখাতে থাকল।

ভুলু হালে বসে পড়ল। নারাণ, হারাণ দাঁড় টানছে, নদীর কিনার ধরে ওরা চলতে থাকল দামোদরদীর দিকে। জ্যোৎস্না উঠে গেছে। ক্রমশ ওরা গাঁ ছাড়িয়ে উত্তর দিকে চলেছে! ওরা বেশীক্ষণ বাইল না। দুটো প্রকাণ্ড শিমুলগাছের ফাঁক ধরে যে খাল নদীতে এসে পড়েছে সে খালটার ভিতর ওরা ঢুকে গেল। খালে জল কম বলে লগি ফেলতে পারল হারাণ। হারাণের হাতে এখন প্রচণ্ড শক্তি। সে যেন এখন অনায়াসে দশ মাইলের মত নৌকা বাইতে পারে।

জায়গাটা নির্জন। গ্রাম অনেক দূর। খালের ধারে অনেক পাটের জমি। পাট কাটা হয়ে গেছে। জ্যোৎস্নায় একটা প্রকাণ্ড দীঘির মত মনে হচ্ছে পাটের জমিগুলোকে। ওরা জমির বুকে লগি পুঁতল। পাটাতনের নীচ থেকে ভুলু হাঁড়িটা, উনুনটা তুলে নৌকার একপাশে রাখল। উনুনটা খুব ছোট বলে অন্য পাশে হারাণ বসল, নারাণ

দা দিয়ে কাঠগুলোকে আরো ছোট করছে। হারাণ চালটা ধুয়ে দিল এক সময়, তিনটে আলু সঙ্গে। দূরের গ্রামে আলো জ্বলছে। এখানে কোনো আলো নেই, জ্যোৎস্নার আলোটাই একমাত্র আলো। এই আলোয় ওরা সব কাজগুলো সারবে। রান্না চড়াবে ভুলু এই আলোয়।

রান্না চড়ানো হল। উনুনের ভিতর কাঠ গুঁজে দিচ্ছে ভুলু। আলোটা ওর মুখে এসে পড়ছে। ভুলু চুপচাপ। মনের ভিতর ওর এখনও যেন কিসের একটা যন্ত্রণা খচখচ করে বাজছে। উনুনের আবীর আলোয় ভুলুকে খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। পাটাতনের অন্য পাশে হারান্, নারাণ মাছটাকে নিয়ে খেলা করছে। ভুলুরও খেলা করতে ইচ্ছে হল মাছটার সঙ্গে। সে ঘাড় ফিরিয়ে জলের ওপর উপুড় হয়ে মাছটাকে দেখল। মাছটা জ্যোৎস্না দেখার মত করে মুখটা জলের ওপর ভাসিয়ে রেখেছে। ঠিক বড় গজাল মাছের মত মুখটা দেখাচ্ছে এখন। চোখ দুটো মাছটার যন্ত্রণায় জ্বলছে যেন। সে ফের একটা কাঠ গুঁজে দিল উনুনে। উনুনে কাঠ জ্বলছে আর জ্বলছে। ঠিক এমনি একটি আগুন ভুলু কোথায় যেন জ্বলতে দেখেছিল। চাঁইন মাছের দুটো চোখে সেই আগুনের প্রতিচ্ছায়া। ঠিক এমনি দুটো আগুনের প্রতিচ্ছায়া কার চোখের ভিতর সে যেন কবে একবার প্রত্যক্ষ করেছিল। কার চোখে? কার চোখে? সে মনে করতে পারছে না। সে ভাবছে আর ভাবছে।

সে ধীরে ধীরে সব কিছুই মনে করতে পারল: মনে করতে পারল ঠাকুর্দার মৃত্যু অনেকদিন আগে হয়েছে। শীতের রাত। ভুলু পূবের ঘরে ঘুমুচ্ছিল। খুব ছোট। গুঁড়ি মেরে লেপের নীচে মায়ের বুকে মুখ রেখে ঘুমচ্ছিল। ভুলু বেশী বয়েস পর্যন্ত মায়ের দুধ খেয়েছে। সে মায়ের বুকে কিছু যেন খুঁজছিল। মা। তার মা। সে বিছানার দুদিকে হাতড়ে হাতড়ে মাকে খুঁজল। মা নেই বিছানায়। সে কাঁদল। ঘরের দরজা খোলা দেখে সে আরো জোরে কাঁদতে থাকল। সে সময় মা চুপচাপ বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালেন চৌকাঠ পার হয়ে। ভুলু উঠানের ওপর তখন অনেকগুলো

মানুষের কান্না শুনতে পাচ্ছে। ওরা কাঁদছে কেন! মা এসে বললেন, এ-ভাবে এখন কাঁদতে নেই। ওঠ। তোর ঠাকুর্দা মারা গেছেন।—মায়ের মুখ দেখে ভুলু কোনো কথা বলতে পারল না। মাকে জড়িয়ে ধরে মায়ের সঙ্গে মিশে গেল। মাকে নতুন নতুন মনে হচ্ছে, মা কেমন অপরিচিত কথা বলছেন। 'মরা' কথাটা তার কাছে অপরিচিত নয়। এ-কথা সে মায়ের মুখে আরো শুনেছে। মা যখন পুকুরে স্নান করতেন, ভুলু পাড়ে দাঁড়াত! মা জলে ডুব দেওয়ার আগে বলতেন, আমি মরে যাই ভুলু?—প্রথম প্রথম ভুলুর কোনো জবাবের প্রতিক্ষা না করেই ডুব দিতেন, ভুলুর দম বন্ধ হয়ে আসত ভয়ে, কিন্তু ঠিক তখুনি মা জলের ওপর ভেসে ফুঁকি দিতেন। ভুলু হাসত। শেষদিকে মায়ের সঙ্গে ভুলুর এটা খেলা হয়ে গেল। সে বলত মার চিবুক ধরে, (চিবুক ধরে কথা বলার স্বভাব ভুলুর এখনও আছে) মা আজ তুমি অনেক মরবে, কেমন?—মা হেসে বলতেন, আচ্ছা। তুই কাঁদতে পারবি নে কিন্তু।···মা সেই মৃত্যুর কথাই আজ বলছেন, তবে হেসে নয়, কেমন কান্না কান্না গলায়। মাকে অপরিচিত মনে হচ্ছে। এবং মায়ের মুখটা অদ্ভুত রকমের লাগছে। মা ভুলুকে কোলে নিয়ে উঠোনে নেমেছিলেন একসময়। দুটো হ্যারিকেন জ্বলছে দু ঘরের দাওয়ায়। একটা হ্যারিকেন জ্বলছে উঠোনে। উঠোনের উপর মানুষের ভিড়। মানুষের মুখগুলো সব পরিচিত। একটা মানুষকে উঠোনের ওপর উত্তর-দক্ষিণ করে শুইয়ে রাখা হয়েছে। সে কাছে গিয়ে বুঝতে পারল ঠাকুর্দাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। শিয়রে পাগল-জ্যাঠামশাই বসে আছেন। ঠাকুর্দার মুখ থেকে লেপটা তুলে বার বার মুখ দেখছিলেন তিনি। সকলেই কাঁদছে, কেবল পাগল-জ্যাঠামশাই কাঁদছেন না। তিনি সব পরিচিত মুখগুলোকে বড় বড় চোখে দেখছেন। ভুলু মায়ের কোল থেকে তখন ইচ্ছা করেই নেমে গেল। পাগল-জ্যাঠামশাইয়ের পাশে বসে পাগল-জ্যাঠামশাইয়ের মত করে ভাবল, সোনা পিসি, ধন পিসি, কাকা, জ্যাঠা সকলে বোকা। ঠাকুর্দা ঘুমিয়ে রয়েছেন অথবা মার মত ফুঁকি

ফুঁকি খেলছেন এখন। সেজন্য কেউ কাঁদে নাকি। কিছুক্ষণ পরেই ঠাকুর্দা উঠে বসে সকলকে ফুঁকি দেবেন এবং হাসবেন। তাই ভুলু কাঁদল না। পাগল-জ্যাঠামশাইয়ের মত সে এখন গরম খুঁজছে। বড্ড শীত, পাতলা চাদরটায় শীত আটকাচ্ছে না। ঠাকুর্দার লেপের নীচে অনেক গরম। সে ধীরে ধীরে লেপের নীচে হাত-পা ঢুকিয়ে শরীরটা গরম করতে চাইল।

শরীরটা ওর ক্রমশ গরম হচ্ছে। সে নিজেও জানতে পারল না কখন গুড়ি গুড়ি সমস্ত শরীরটাকে লেপের ভিতর ঢুকিয়ে দিল। সকলের অলক্ষ্যে ব্যাপারটা ঘটে গেল। কেবল পাগল-জ্যাঠামশাই দেখতে পেলেন ভুলু লেপের নীচে ঘুমুচ্ছে। সমস্ত শরীরই ওর লেপ দিয়ে ঢাকা। কি আশ্চর্য। ছেলেটা গেল কোথায়? পরিচিত মুখগুলোর মুখে উৎকণ্ঠা জেগে উঠেছে। 'ভুলু, ভুলু' করে সকলে ডাকতে থাকল। কোথাও নেই, কোনো ঘরে নেই। ঠাকুর্দাকে পুকুরপাড়ে নিয়ে যাওয়া হবে, অর্জুন গাছটার নীচে দাহ করা হবে, সব নাতি-নাতনীদের সঙ্গে ভুলুও বিছানা স্পর্শ করে পুকুরের ধার পর্যন্ত যাবে—অথচ সে নেই। আর একটা কান্নাকাটি তখন আরম্ভ হবে হবে ভাব। পাগল-জ্যাঠামশাই পরিচিত মুখগুলোকে তখনও ঘুরে ফিরে দেখছেন।

মড়াকে বাসিমড়া করা হবে না বলেই সকলে ধরাধরি করে বিছানাটা অর্জুন গাছটার নীচে নিয়ে এল। ভুলুকে তখনও খোঁজা হচ্ছে। পুকুরে জাল ফেলা হবে কিনা ভাবা হচ্ছে। সে সময় অর্জুন গাছটার নীচে শ্মশানবন্ধুরা হ্যারিকেনের অস্পষ্ট আলোয় দেখল, লেপের তলায় ঠাকুর্দা নড়ছেন। ও-পাশের অন্ধকারে দুটো চোখ জ্বলছে,—পাগল-জ্যাঠামশাই জানালার আমগাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ঠাকুর্দাকে দেখছেন। ওরা ঠাকুর্দাকে লেপের তলায় নড়তে দেখে ভয় পেয়েছিল, কিন্তু সোনা-জ্যাঠামশাই বিছানার ওপর বসে আছেন—তিনি ঠাকুর্দাকে নড়তে দেখেও ভয় পেলেন না। পাশে ডাকাতি চিতা সাজাচ্ছে আমকাঠের। সোনা জ্যাঠামশাই ধীরে ধীরে লেপটা সরিয়ে দেখলেন, ভুলু ঠাকুর্দাকে জড়িয়ে একটা পা ঠাকুর্দার

শরীরের ওপর দিয়ে আরামে আবার ঘুমোবার জন্য চেষ্টা করছে। ভুলুর শরীর গরম, ঠাকুর্দার মুখে পরম প্রশান্তি। সোনা-জ্যাঠামশাই ডাকলেন, ভুলু ওঠ।—সকলকে তিনি ডেকে বললেন, বাড়িতে খবর দে, ভুলুকে পাওয়া গেছে।

ভুলু উঠে প্রথমে আড়মোড়া ভাঙল, তারপর চারিদিকে চেয়ে সে চিন্তিত হল। সে এখানে কেন! সোনা-জ্যাঠামশাই মুখ ভার করে বসে আছেন কেন! অনেকগুলো মানুষ কড়ুইগাছের নীচে হ্যারিকেন জ্বালিয়ে খোল-করতাল বাজাচ্ছে কেন! এক ফোঁটা শিশির ওর গায়ে ঝরে পড়ল, একটা পাখি ডাকল, শেষরাতের এক ফালি কুমড়োর মত চাঁদটাও দেখতে পেল সে, তবু যেন কেমন এক অনিয়মের গন্ধ এখানে। সব পরিচিত মুখগুলো অপরিচিত লাগছে। কেবল ঠাকুর্দাই যেমন ছিলেন, তেমনি আছেন। তিনি ঘুমুচ্ছেন। ফুঁকি-ফুঁকি আর খেলবেন না, শরীর ভালো নেই হয়ত, সেই কাশিটা আবার উঠেছিল বোধহয়। অনেকগুলো সম্ভব-অসম্ভবের কথা চিন্তা করার সময় দেখল জ্যেঠিমা তাকে কোলে তুলে নিচ্ছেন। পাশে মা। মার চোখগুলো ভার ভার, লাল। মা কথা বলতে পারছিলেন না। ঘড়া ঘড়া জল তুলে আনা হচ্ছে। বাবা, কাকা, সোনাভাই, ধনাভাই সকলে জল তুলছে ঃ মাও সেখানে জল তুলতে গেলেন। জ্যেঠিমা ভুলুকে নামিয়ে দিলেন সে সময়। মা-জ্যেঠিমা এখন তেল মাখাচ্ছেন ঠাকুর্দার পায়ে।

ঠাকুর্দার জামাকাপড় তোশকচাদর সব ভিন্ন করা হয়েছে। সকলে মিলে ঠাকুর্দাকে উলঙ্গ করিয়ে দিল। ঠাকুর্দার খোলা শরীর দেখে ভুলুর কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে। তিনি জেগে সকলকে ধমক দিচ্ছেন না কেন! পাগল-জ্যাঠামশাই পাশে দাঁড়িয়ে হাত-কচলে বিড় বিড় করে সকলকে কি সব বলছেন! তিনি যে খুব রেগে গেছেন ভুলু তা বুঝতে পারল। মা-জ্যেঠিমা তাঁরা তীব্র শীতের ভিতর ঠাকুর্দাকে স্নান করালেন। তাঁরা এখন কাঁদছেন না। ভুলুকে পর্যন্ত সকলে জোর করে ধরে নিয়ে গেল। সকলের দেখাদেখি এক ঘটি জল সেও

কনকনে শীতের ভিতর ঠাকুর্দার গায়ে ঢেকে দিল। পাগল-জ্যাঠা-মশাইকে দিয়ে সকলের শেষে জল ঢালানো হল। পাগল-জ্যাঠামশাইয়ের চোখ দুটো এখন ছলছল করছে। ভুলু কাঠের পুতুলের মত সব দেখল। ওর মনটা কাঠের পুতুলের মত হয়ে গেছে। কিন্তু সকলে যখন ঠাকুর্দার মুখে আগুন ঢুকিয়ে দিচ্ছে এবং পাগল-জ্যাঠামশাইকে ধরে এনে মুখাগ্নি করানোর চেষ্টা চলেছে, ওর পুতুল-মনটা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। সে কাঁদছে আর কাঁদছে। পাগল-জ্যাঠামশাইও হাউ হাউ করে কাঁদছেন। ঠাকুর্দাকে চিতায় তুলে দেওয়া হল। আগুন ধরানো হল। চিতা জ্বলছে। ভোর হয়ে আসছে। চিতার আগুনটা পাগল-জ্যাঠামশাইয়ের দু চোখেও জ্বলছে। এখন সব নিয়ে তিনটে চিতা হয়ে গেল। ভুলুর পুতুল-মনটা দেখল সেই চিতার ভিতর ঠাকুর্দার সঙ্গে ওরা দুজনও যেন জ্বলছে।

সেজন্যই ভুলু পাটাতনে বসে চাঁইন মাছের সে চোখদুটোর দিকে চাইতে পারছে না। উনুনের আগুন চাঁইন মাছের দু চোখে দুটো আগুনের প্রতিচ্ছায়া সৃষ্টি করেছে। ভুলু যতবার ঘাড় ফিরিয়ে চাঁইন মাছের চোখ দুটোর দিকে চাইল, ততবার সে শুধু আমগাছের ছায়ায় পাগল-জ্যাঠামশাইয়ের চোখ-দুটোকে দেখতে পেল। সেই চোখ সেই আগুনের ছায়া। সেজন্য ভুলু শুধু উনুনের ভিতর কাঠ গুঁজে দিল আর উপুড় হয়ে থেকে ভাবল, ঠাকুর্দাকে, পাগল-জ্যাঠামশাইকে, ঠাকুর্দার মৃত্যুর রাত্রিকে, আর মৃত্যুর সম্বন্ধে সেই ভৌতিক চেতনাকে। মৃত্যু কথাটাকে সে বার বার ভাবল। চাঁইন মাছের কাল মৃত্যু হবে। দুদিন পর পূর্ণিমা দেখে নারাণ শঙ্খিনীকে মেরে কবর দেবে শঙ্খিনী নিশ্চয়ই এ-তিনদিনে বুঝে গেছে ব্যাপারটা। চাঁইন মাছটাও হয়ত সেই কথাই ভাবছে। কিন্তু মৃত্যু সম্বন্ধে কি ওদের কোনো চেতনা আছে! ওরা কি মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু উপলব্ধি করতে পারে। উপলব্ধি কথাটা ভুলু মাস্টারমশাইয়ের মুখে বার বার শুনেছে। এই কথাটা তারও ভালো লাগে। উপলব্ধি কেমন একটা বিচিত্র কথা যেন। বিচিত্র উপলব্ধি যেন। সে যেন বুঝতে পারছে এখন, মাছটাকে যখন

কাটা হবে তখন রক্ত পড়বে। মাছটার কষ্ট হবে। মাছটার এক-রকমের কান্না নিশ্চয়ই আছে, যা তাদের মত মানুষেরা বুঝতে পারে না, ধরতে পারে না। উপলব্ধি কথাটার প্রতিচ্ছায়া ওর মনের আয়নায় তখন দাগ কাটছিল। তাই সে চাঁইন মাছের কান্নাটা শোনার কিংবা বোঝার চেষ্টা করছে। উনুনে কাঠ ঠেলে দিল, যাতে কোন শব্দ না হয়; তাতে তার উপলব্ধি চাঁইন মাছের কান্না বাধা না পায়। কিন্তু পাটাতনে হারাণ কাঠ কাটতে এত বেশী শব্দ করছে যে চাঁইন মাছের কান্না শোনা দূরে থাক, পাটাতনের নীচে শঙ্খিনীর ফোঁস ফোঁস শব্দটা পর্যন্ত সে শুনতে পেল না। সে বিরক্ত হচ্ছে হারাণের ওপর। অবশ্য বাইরে সে কিছুই প্রকাশ করল না। শুধু বলল, হারাণ, কাঠগুলো আর ছোট করতে হবে না। ভাত প্রায় হয়ে আসছে।—সে ঢাকনাটা উদাম করে একটা কাঠি দিয়ে কয়েকটা চাল টিপে বলল, আর কাঠ লাগবে না, এবার চুপ করে একটু বোস। তিনদিন ধরে অনেক খেটেছিস, এবার একটু বিশ্রাম কর।

হারাণ খুশী হল ভুলুর কথাগুলো শুনে। সে জলের ওপর ফের উপুড় হয়ে পড়ল। দড়িটা কাছে টেনে মাছের মাথায় হাত বুলোতে থাকল। মাছটাকে সে আদর করছে। মাছটার তিনটে ভাগ কে কতটা পাবে দড়ি টেনে টেনে সে তা দেখছে।

আউশ ধানের নতুন চাল। সোঁদা সোঁদা গন্ধ উঠছে হাঁড়ির থেকে। হাঁড়ির ঢাকনা উদাম করা। ভাতগুলো টগবগ করে ফুটছে। ফেনটা এঁটে যাচ্ছে ক্রমশ। জল ভুলু ইচ্ছা করেই কম দিয়েছিল, ফেন-আঁটা ভাত হবে বলে। কাঁচা লঙ্কা, পেঁয়াজ দিয়ে ভুলু এখন বেশ করে ডলে নিল আলুগুলো। ভাতটা সে বেড়ে দিল দু থালায়। যে ভাতটুকু বেশী থাকল হাঁড়িতে, সেটা নারাণের দিকে ঠেলে দিল। আর তার ভাত লাগবে না। সে এ কথাও জানাল। ওদের লাগলে হাঁড়ি থেকে ওরা যেন নিয়ে নেয়। সে গলুইয়ের দিকে সরে বসল। গরম পড়েছে খুব। তার ওপর গরম ভাত। সে খুব ঘামতে থাকল। ডেলা ডেলা ভাতগুলো গিলে একথালা জল খেল

বর্ষার।' তারপর সে সেই নক্ষত্রটাকে খুঁজতে থাকল, গতরাত্রে যে-নক্ষত্রটাকে সে ঠাকুর্দার মুখ বলে ভেবেছে। আকাশটা জ্যোৎস্নায় এত বেশী সাদা হয়ে গেছে যে খুব কম নক্ষত্রই আকাশে দেখা যাচ্ছে। তবু সে গতরাতের কোনো উজ্জ্বল নক্ষত্রকে ঠাকুর্দার মুখ ভেবে নেবার জন্য পা দুটো সামনের দিকে ছড়িয়ে দেবার সময় শুনল গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে একটি বিশেষ পরিচিত ধ্বনি (যা শুনলে সে অত্যন্ত ভয় পায়) প্রতিধ্বনি হয়ে দূর থেকে দূরান্তে চলে যাচ্ছে। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে, ক্রমশ পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে সে ধ্বনিগুলো আতসবাজির মত ছড়িয়ে পড়ল। রাইপুরা এবং অন্যান্য হিন্দুগ্রামগুলো জ্বালিয়ে দেবার সময়ও এমন একটা চিৎকার রাইনাদীর পাশে টোডারবাগ (মুসলমান গ্রাম) থেকে উঠেছিল। সেই ভয়াবহ চিৎকার শুনে সোনা-জ্যেঠি, বড়-জ্যেঠি, মা পুকুর-পাড়ে বেতের ঝোপে এক রাত্রি লুকিয়েছিলেন। ভুলুকে মা জড়িয়ে ধরে ঠাকুরকে ডেকেছিলেন সারারাত ধরে। সব সোনার জিনিস, কাঁসার থালাবাসন ছাইগাদার নীচে রনা লুকিয়ে রেখেছিল। সেই চিৎকারটা টোডার-বাগ হয়ে কাঁওনা, কাইন্দী, সুলতানসাহাদী, কের ওটা ফিরে আড়াই হাজারের দিকে ছুটতে ছুটতে গিয়েছিল। তারপর গোপালদী, বাবুর-হাট হয়ে কতদূর পর্যন্ত গিয়েছিল ভুলু সে কথা আজ আর মনে করতে পারে না। ভুলুর সেই পুতুল-মনটা আবার ভয় পেতে সুরু করছে। নারাণ ও হারাণ 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ', 'আল্লাহু আকবর' শব্দগুলো কান পেতে শুনছে। ওরা চোখ বড় বড় করে লক্ষ্য রাখল কোথায় এবং কোন দিকে সেই ধ্বনি প্রবাহিত হচ্ছে।

ভয়ে ওরা তিনজনেই প্রথমে ঘুমোতে পারল না। ফিসফিস করে তিনজন শুধু সম্ভব-অসম্ভবের কথা নিয়ে গল্প করল।

নারাণ ভাতের হাঁড়িটা ওর পায়ের কাছে রাখল। পাটাতনের একটা কাঠ তুলে হাঁড়িটাকে বসিয়ে রাখল ভিতরে। একটা হাত মাথার নীচে রেখে সে ঘুমোবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ঘুম আসছে না বলে ডাকল, ভুলু ঘুমোলি?

ভুলুর চোখে তন্দ্রা এসেছিল। নারাণের ডাকে তা ভেঙে গেল।

—ঘুমোই নি। কিছু বলবি?

—ভাবছি ভোরে খালে চলে যাব। খাল ধরে দামোদরদীর বিলে পড়ব। বিলের ভিতর দিয়ে ভাদ্রমাসে একটা আল পড়ে। সে আল ধরে আস্তানা সাহেবের দরগার খালে পড়তে পারব।

—কিন্তু খুব যে ঘুরতে হবে তবে।

—তা ছাড়া উপায়ই বা কি বল? হামচাদীর মাঠ ধরে গেলে ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে যেতে হবে। ধানপাতার পোঁচ লাগবে মাছটার গায়ে। গা কেটে ওর রক্ত পড়বে।

নারাণের মুখে এমন কথা শুনে ভুলু অদ্ভুত আনন্দ পেল। এত বড় মাছটার সুখদুঃখ নারাণও বোঝে—একথা ভেবেই ভুলুর পুতুল-মনটা খুশীতে ভরে উঠেছে এবং অদ্ভুত এক আনন্দ পেয়েছে সে। ভুলুর পুতুল-মনটা কেন জানি নিশ্চিন্ত হল, নির্ভয় হল। সে অন্যপাশে ফিরে ঘুমোবার চেষ্টা করল ফের।

চাঁইন মাছের দড়িটা গুড়াতে বাঁধা আছে। হারাণ তবু নিশ্চিত হতে পারছে না বলে সে উঠে একবার বসল এবং শক্ত গিঁট টেনে টেনে আরো শক্ত করল। শেষে বাকি দড়িটা পায়ে বেঁধে শুয়ে পড়ল। গুড়ার গিঁট ফসকালে পায়ের গিঁট যেন না ফসকায়। অথবা যাতে করে বৈদ্যের বাজারের ভিড়টা চুপি চুপি রাতে মাছটা চুরি করতে না পারে।

ওরা তিনজন এবার ঘুমিয়ে পড়ল।

জ্যোৎস্না রাত। একদল বাদুড় উড়ে যাচ্ছে। ধানক্ষেতে কোড়ার ডাক উঠল। মেয়ে-কোড়াটা হয়তো ডিম পাড়ছে। ওরা তিনজন ঘুমোল, আর ঘুমোল, কারণ তারা সে-সব কিছুই শুনতে পায় নি।

ঘুমোবার আগে ভুলু ঠাকুর্দা-নক্ষত্রকে আকাশে খুঁজেছিল, পাগল-জ্যাঠামশাইয়ের মুখ বিভিন্ন প্রকার জীব-জন্তুর মুখের সঙ্গে কল্পনা করেছিল। পৃথিবীর বিচিত্র জীবজন্তুর মুখের সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে

পায় নি, কেবল টাঁইন মাছের চোখ দুটোর সঙ্গে পাগল-জ্যাঠামশাইয়ের চোখ দুটোর সামান্য সাদৃশ্য আছে। সে-কথা ভাববার সময়ই সে ঘুমিয়ে পড়ল এবং স্বপ্ন দেখল—পৃথিবীর বুকে লক্ষ লক্ষ ফাটল দেখা দিচ্ছে। ফাটলের মুখে বিচিত্র জীবের কাটা গলা সে দেখতে পাচ্ছে। একটা ফাটলের মুখে পাগল-জ্যাঠামশাই ঠাকুর্দার গলা টিপে ধরেছেন। তিনি অনেকগুলো অসংলগ্ন কথা বলছেন ঠাকুর্দাকে। তার ভিতরে সে দুটো কথার অর্থ জানে। প্রথম কথাটা 'লাভ', দ্বিতীয় কথাটা 'স্যাড'। জ্যাঠামশাইয়ের অসংলগ্ন কথা শুনে এবং ঠাকুর্দাকে মেরে ফেলতে দেখে ভুলু ছুটছে। হুতু-কাকাকে খবর দেবার জন্য সে প্রাণপণ ছুটল। সে এখন এত হাল্কা যে বিরাট বিরাট ফাটলের মুখগুলো এরোপ্লেনের মত পার হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর এই ফাটলগুলো অদ্ভুত রকমের—কোনো ফাটলে রক্তের সমুদ্র, কোনো ফাটলে কোটি কোটি মানুষ পচে পোকা-মাকড় হয়ে গেছে। পোকা-মাকড়গুলো মানুষের মুখ দিয়ে (বাকি শরীরটা কুমির মত) বেয়ে উঠতে গিয়ে বার বার অতলে পড়ে হারিয়ে যাচ্ছে। কোনো ফাটলে বীভৎস অত্যাচার। (অনেকটা রাইপুরা গ্রাম জ্বালিয়ে নারী-পুরুষদের ওপর অত্যাচারের মত) খুব ভাগ্য ভুলু এখন এরোপ্লেনে, সেজন্য সে সব কিছু দেখতে পারছে এবং খুব তাড়াতাড়ি পৃথিবীর এই নরক অতিক্রম করতে পারছে। সে যত ফাটল অতিক্রম করে ভাবছে তার সেই সুন্দর পৃথিবীতে ফিরে যাবে, ততো কুৎসিত জগৎ থেকে অন্য কুৎসিত জগতে নেমে গেল সে। এখানে জল নেই, হাওয়া নেই, কোড়ার ডাক শুনতে পাচ্ছে না, হুট্টিকুটুম পাখিরা উড়ছে না, ডারকীনা এলকোনা মাছ ফুটকরী ছাড়ছে না। সব যেন শূন্য, সব যেন অন্ধকার। সে আর কিছুতেই নিশ্বাস ফেলতে পারল না। ওর দম বন্ধ হয়ে আসছে। মনে হল তার সে মরে যাচ্ছে, শুধু ওর পুতুল-মনটা বেঁচে আছে। ভুলু এবার সত্যি মরে গেল। ওর পুতুল-মনটা কিন্তু অনায়াসে সব পৃথিবীতে, সৌরজগতে ঘুরতে পারছে। হাওয়া, জল, আকাশ নেই বলে ওর পুতুল-মনটার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না,

পৃথিবী যত গভীর হোক, অন্ধকার হোক তার জন্য ওর কিছু আসে যায় না। পুতুল-মনের কাছে আগের পৃথিবী, পরের পৃথিবী বলে কিছু নেই, পুতুল-মন সব পৃথিবীর হয়ে, সবকালের হয়ে, বেঁচে থাকল। ভুলুর দেহটার পাশে পুতুল-মনটা বসে রয়েছে। তারপর ধীরে ধীরে ওটা ফের ওর শরীরে ঢুকে গেল এবং সে এখন অনায়াসে আবার কাটল পার হতে পারছে। এখানে সে নিজের পৃথিবীর চেহারাকে খুঁজে পাচ্ছে। কডুই গাছ, কদম গাছ না থাকলেও, ছুটো একটা ডেফলের গাছ সে দেখতে পেল। ছুটো একটা লটকানের গাছ ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। একটা মেয়ে লটকান ছিঁড়ে এক থোকা লটকান ওর হাতে দিল। বলল, নাও। তুমি খাবে। এ লটকান টক নয় মিষ্টি। আমি হেনা, চিনতে পারছ না? আমি মরে গিয়েও অন্যরকম হই নি! সেই হেনাই আমি আছি। চল না দেখবে কি করে সকলে আমাকে অলিপুরা পোড়াতে নিয়ে যাচ্ছে। আমাকে কাঠ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হবে। ঈদা অন্য নৌকায় বসে আমার জন্য কাঁদছে। একি তুমিও আবার কাঁদতে আরম্ভ করলে!—ভুলুর চোখের জল যেন মুছিয়ে দিল। হেনার এ-পৃথিবীতে জল আছে, নৌকা আছে। কিন্তু হাওয়া নেই, আকাশ নেই। শেষে ভুলু যেখানে পৌঁছল সেখানে সব আছে—আকাশ, জল, হাওয়া, সূর্য, নদী, নৌকা সব। শুধু মানুষ নেই, ভুলু খুব বিস্মিত হল। খুঁজে খুঁজে শেষ পর্যন্ত একটা পিটকিলাগাছ আবিষ্কার করল সে। জলের নীচে অনেক শ্যাওলা। একটা শোলমাছের বাচ্চা সেখানে। ভুলুর এখন খুব আনন্দ। সে জলের নীচে উঁকি দিতে থাকল। তখন শোলমাছের বাচ্চাটা বৈচামাছ মুখে পুরে শ্যাওলার অন্ধকারে হারিয়ে গেল। পরে সে দেখতে পেল, ওর ধরা চাঁইন মাছটা শুঁড় নাড়তে নাড়তে শোল মাছের বাচ্চাটাকে শাসন করবার জন্য যেন ছুটছে। পিছনে রয়েছে শঙ্খিনী। নিজেদের জগতে নিজেরা খুব হেসে-খেলে বেড়াচ্ছে। ভুলুর পুতুল-মনটা এই পৃথিবীকে সত্য জেনে খুব, খুব খুশী।

ভুলু স্বপ্ন থেকে জাগল। ওর বুকটা ধড়ফড় করে কাঁপছে।

জেগে প্রথমেই পাটাতনে হাত বাড়াল, এবং দেখল সে এখন কোথায়। জেগে পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারছে না সে নৌকার পাটাতনেই আছে, সে এতক্ষণ ধরে স্বপ্ন দেখেছে। নাকে হাত দিয়ে ভুলু বেঁচে আছে কিনা পরীক্ষা পর্যন্ত করতে ছাড়ল না। যখন সে উপলব্ধি করতে পারল অন্যান্য অনেক রাতের মত ওটা একটা স্বপ্ন, তখন সে ধীরে ধীরে উঠে বসল। ঘাম-ঘাম শরীর। চোখ দুটো জ্বলছে। সে চোখ দুটো রগড়ে নারাণের দিকে চেয়ে আর চোখ ফেরাতে পারল না। জ্যোৎস্নায় সে সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। ওর গলায় ভয়ে কান্না উঠে এল। হারাণ নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে তখনও। ওর পায়ের সঙ্গে দড়ি বাঁধা। ভুলু খুব সন্তর্পণে দড়িটা খুলে ডাকল, শিগগীর ওঠ হারাণ, দেখ নারাণটা বুঝি মরে গেছে!

চিত হয়ে পড়ে আছে নারাণ। ভাতের হাঁড়ির পাশে নারাণের পা দুটো। গুড়ার ওপর পাদুটো ঝুলছে। শঙ্খিনী পাদুটোকে গুড়ার সঙ্গে প্যাঁচ দিয়ে লেজের দিকের মুখটা পাটাতনের ওপর লম্বা করে রেখেছে। যেন শঙ্খিনীটাও মরে আছে, তেমন ভাব। ভুলু ডাকাডাকি করার সময় নারাণ জেগে গেল এবং ওঠবার সময় দেখল পায়ে টান লাগছে। সে বলল, ভুলু অমন চিৎকার করছিস কেন? পাটা আমার গুড়ার সঙ্গে কে বেঁধে রেখেছে রে!—নারাণ বিরক্ত হচ্ছিল মনে মনে। কিন্তু উঠে যখন দেখল সাপটা ওর পা জড়িয়ে গুড়ার সঙ্গে প্যাঁচ দিয়েছে, তখন সে 'আঃ আঃ' করতে করতে পাটাতনের ওপর পড়ে গেল এবং অন্য কোনো শব্দ সে আর করতে পারল না। ওর মুখ থেকে ফেনা উঠছে।

ভুলু এখন কি করবে ভাবতে পারল না। হারাণকে সে আর ডাকতেও পারছে না। ভয়ে ওর গলাটা আড়ষ্ট হয়ে গেছে। সে আস্তে আস্তে পা দিয়ে হারাণকে ধাক্কা দিতে থাকল। কিন্তু কিছুতেই উঠছে না বলে নীচ থেকে জল তুলে হারাণের নাকে মুখে জল ছিটিয়ে দিল। সে একবার ভাবল বৈঠা তুলে সাপের মাথায় বাড়ি দিলে কেমন হয়। কিন্তু তার আগে সাপটা দু মুখ এক করে

যদি নারাণকে ছোবল দেয়? ভুলু এই মুহূর্তে বুঝতে পারছে সাপটা কি করে চাঁই থেকে বের হয়ে এল! ছোবল এখন পর্যন্ত না দেওয়াই আশ্চর্য! ভুলু ভয় পেয়ে ভগবানকে ডাকতে থাকল।

হারাণের নাকে ফের জল ছিটিয়ে দেওয়ায় সে জাগল। সে চোখ খুলল না। চোখ বুজেই আড়া-মোড়া ভাঙল এবং ভুলুর ওপর বিরক্ত হয়ে বলল, কিরে ভোর হল! খুব ত জ্বালাতন শুরু করেছিস! না আর একটুকুন ঘুমোন যাবে?

ভুলু এতক্ষণ পর সাহস পেল।—উঠে দেখ সর্বনাশ হয়ে রয়েছে। নারাণের পায়ে শঙ্খিনী প্যাঁচ দিয়ে আছে।

হারাণ চোখ দুটো বড় বড় করে খুলে ধরল। ভয়ে মুখটা সে ব্যাঙের মত করে দিয়েছে। গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ উঠছে না। সাপটা চাঁই থেকে ছুটে গেছে ভাবতেই ওর সব শরীরের রক্ত যেন হিম হয়ে এল। সে জমে যাচ্ছে ক্রমশ। কিন্তু সে কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে জলের ওপর লাফ দিয়ে সাঁতরাতে থাকল। আর বলতে লাগল, ভুলু আমি চললাম। মাছের রাজাকে যারা ধরে তারা কেউ বাঁচে না। শিগগীর নৌকা থেকে পালিয়ে আয়। শালা নারাণকে সাপে খাক! আমাকে যেমন টুসটুসির বাচ্চা বলে। এবার ও শালা নিজেই টুসটুসির বাচ্চা হয়ে গেল! নৌকায় থাকলে তুই মরবি, তোকেও ছোবল দেবে শঙ্খিনী। তোদের দুজনের একজনকেও আস্ত রাখবে না।

হারাণের গলার আওয়াজ জলার অন্য পাশে ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এল। কয়েক টুকরো মেঘ আকাশের নীচে জমা হতে শুরু করেছে এবং হারাণ যেদিকে সাঁতরে জল কাটছে মেঘগুলো সেদিকটা অন্ধকার করে তুলল। হারাণের সাঁতার কাটার শব্দ শুনতে পেয়ে ভুলু বুঝতে পারল হারাণ ভয়ে দিক-বিদিক সাঁতার কাটছে। ওর সামনে রয়েছে দামোদরদীর বিস্তীর্ণ বিল, ধানক্ষেত আর শাঁপলা-শালুকের জমি। সেখানে অনেক বিচিত্র রকমের সাপ বাস করে। ভুলু এবার গলা ছেড়ে ডাকল, হারাণ তুই সামনে আর যাস না। তুই